পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ

(সচিত্র)
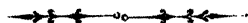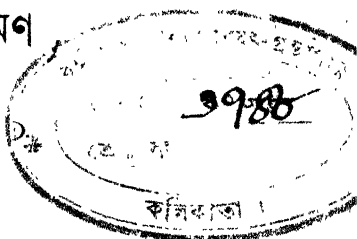
শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ,

লিখিত
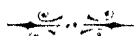
প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা
৬৫।১ বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, "শিশু প্রেস" হইতে
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

শ্রীশ্রীনারায়ণপ্রীতিরস্তু।

১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পরশুরামকুণ্ড এবং ১৩১৭ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে বদরিকাশ্রম গিয়াছিলাম। পরশুরামকুণ্ড ভ্রমণ-কাহিনী ১৩১৭ সালে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এবং বদরিকাশ্রম-পরিভ্রমণ বৃত্তান্তও ঐ সালে "বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। সংশোধন ও সংযোজন অতি সামান্যই করা হইয়াছে।

লোকে তীর্থ করিয়া তাহা প্রকাশ করে না, ইহাতে নাকি পুণ্য ক্ষয় হয়। এই দুইটি তীর্থ অতি কঠিন বিবেচনায় হিন্দু সাধারণ—বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ—ঐদিকে কমই গিয়া থাকেন। যদি এই ভ্রমণ-কাহিনী দ্বারা এই তীর্থদ্বয় দর্শনার্থ ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গীয় নরনারীর কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে তীর্থ ভ্রমণ বর্ণনা দ্বারা যে টুকু পুণ্য ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা তাহার ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হইল মনে করিব। ইতি—

গৌহাটি,
১৩২১ বঙ্গাব্দ

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।
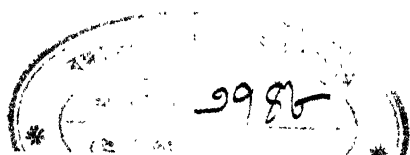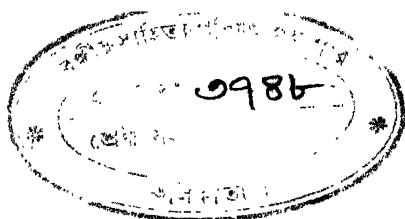
পরশুরাম কুণ্ড।

আসামে দুইটি মহাতীর্থ বিদ্যমান; কামাখ্যা মহাপীঠ এবং পরশুরাম কুণ্ড। ইদানীং আসামবেঙ্গল এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের দ্বারা কামাখ্যা যাত্রীদের যাতায়াতের বহু সুবিধা হইয়াছে। পরশুরাম যাত্রীদের এখনও তেমন সুবিধা হয় নাই। তবে তিনসুকীয়া পর্য্যন্ত আসামবেঙ্গল রেলওয়ে এবং দিব্রুগড় পর্য্যন্ত ডাক জাহাজ চলার পর পরশুরামের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে বই কি? কিন্তু যে পথটুকুর কথা উপলক্ষে পরশুরামের পথের দুর্গমতা পূর্ব্বাবধি লোক-সমাজে প্রচারিত আছে উহা এখনও সুগম হয় নাই।

সদিয়ার পথ।

ডাক জাহাজে দিব্রুগড় অথবা আসামবেঙ্গল রেলওয়েযোগে তিনসুকীয়া পৌঁছিয়া পরশুরাম যাত্রীদিগকে দিব্রুসাদিয়া রেলওয়ে চড়িয়া সদিয়া অভিমুখে যাইতে হয়। নামে "দিব্রুসদিয়া" হইলেও এই লাইনটি এখনও সদিয়ায় পৌঁছে নাই। বর্ত্তমানে তালাপ পর্য্যান্ত গিয়াছে, শীঘ্রই সৈখোয়া পর্য্যন্ত যাইবার কথা।* সৈখোয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র এখানে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত। দিব্রুসদিয়া লাইন এই ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যে কদাপি অপরতীর হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সদিয়ায় পৌঁছিয়া সার্থকনাম হইতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক

* সম্প্রতি সৈখোয়া পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে।

তালাপ পর্য্যন্ত গাড়ীতে গিয়া পদব্রজে বা গরুর গাড়ীতে ৯ মাইল গেলেই সৈখোয়া, এবং সেইস্থান হইতে ১ মাইল পরিমাণ চর অতিক্রম করিয়া খেওয়া ঘাট পাওয়া যায়। সেইখানে নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিলেই সদিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। নৌকা ত নয় কুঁদা, অনেকটা ডোঙ্গার মত। পাঁচ সিকা আন্দাজ দিলেই নৌকাযোগে সদিয়ার ঘাটে পৌছান যায়। তবে ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে হয়, তাই প্রায় তিন চারি ঘণ্টা সময় লাগে। তালাপে সরাইখানা আছে, যাত্রীরা তাহাতে বেশ থাকিতে পারে। সৈখোয়ায়ও মাড়ওয়ারী মহাজন-দের কয়েকটি "ঠাকুরবাড়ী" আছে, তাহাতে যাত্রীরা আশ্রয় লইয়া থাকে। তালাপে দিনে দুইবার রেলগাড়ী যায়, এক প্রায় ১২টায় অপর প্রায় ৩॥ টায়। চেষ্টা করিলে তালাপে কুলী ও গরুর গাড়ী সহজই পাওয়া যায়। কুলী সদীয়া পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিতে দুই দিনের বেতন ॥০ আনা হিসাবে ১৲ টাকা নেয়। গরুর গাড়ীতে সৈখোয়া ঘাট পর্য্যন্ত পৌছিতে ২৲ টাকা লাগে। সৈখোয়ার পর গাড়ী চলে না; ব্রহ্মপুত্রই ইহার প্রধান অন্তরায়। বর্ণনা অপেক্ষা মানচিত্র দর্শনে পথের সমধিক পরিচয় হইবার কথা। এই নিমিত্ত এতৎসহ আসামের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তের মান-চিত্র একখানি দেওয়া হইল। তাহাতে তিনসুকীয়া হইতে পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত সদিয়া গমন পথ চিহ্নিত করা হইল; বর্ণনার সঙ্গে ইহা মিলাইয়া লইলে সহজেই এই পথ বোধগম্য হইবে।

সদিয়া।

সদিয়ায় গবর্ণমেণ্টের একটি সেনা-নিবাস আছে। ইহা হইতে ষোল মাইল দূরেই ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্ত রেখা সুতরাং সদিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত ষ্টেশন বলিয়া ইহার খ্যাতি। এই নগর কুণ্ডিল নদী

মিশমি
ইনার লাইন
ব্রহ্মপুত্র
সৈখোয়া ঘাট
ডিব্রু নদী
দিক্রু সাদিয়া
তালাপ
চুনপুরা
পরশু রাম কুণ্ড
বালেং
লোহিত
খামতি রাজ্য
নোয়া দিহিং নদী
লক্ষ্মীমপুর জেলা
ডিব্রুগড়
তিনসুকিয়া
লেডো
আসাম বেঙ্গল
শিবসাগর জেলা
নাগা জাতি
পরশু রামের পথ
ইনার লাইন চিহ্ন
অর্থাৎ ব্রিটিশ সীমান্ত
গমন পথের চিহ্ন
তিন সুকিয়া হইতে পরশুরামকুণ্ড
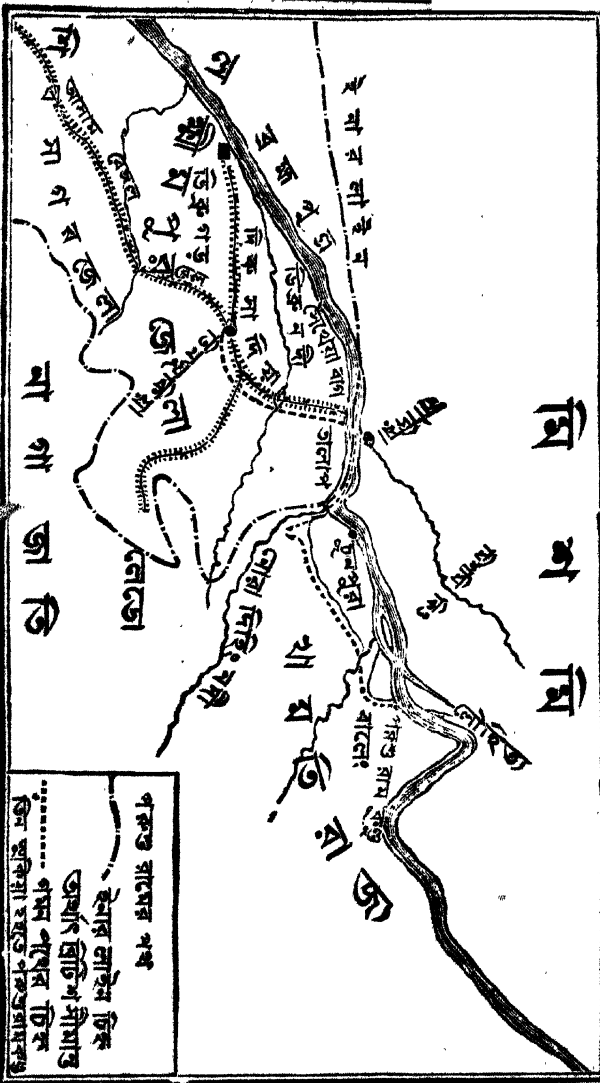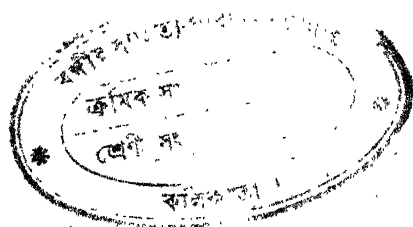
ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। হেমন্তে ব্রহ্মপুত্র একটু দূরে সরিয়া পড়ে; কিন্তু বর্ষায় ইহার খরতর স্রোত সদিয়া ঘেঁসিয়া প্রবাহিত হয়। কুণ্ডিল নদীর সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস একটু জড়িত আছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক রাজার কুণ্ডিন নগরী এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ যে নগরের নামেই নদীরও নাম কুণ্ডিন বা কুণ্ডিল হইয়াছে। যেখানে ভীষ্মক রাজধানী ছিল ঐ স্থানে সম্প্রতি মিশমি জাতীয় লোকের বসতি। ইহারা "চলিকটা" (চুলকাটা) শ্রেণীর মিশমি। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীয়েরা দীর্ঘ কেশ রাখে। কিন্তু ইহারা কেশ ছেদন করিয়া থাকে। ইহারও নাকি কারণ আছে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্যালক রুক্মিণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেন। সেই অবধি এই মিশমিরাও চুল কাটিয়া ফেলে। "মিশমি" শব্দটির সঙ্গে ভীষ্মক রাজার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। যাহা হউক যাহা প্রবাদ তাহা বলিলাম। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার স্থান ইহা নহে।

পরশুরাম তীর্থযাত্রীর পক্ষে সদিয়া অপরিহার্য্য স্থান। পরশুরাম ক্ষেত্র ইনার লাইনের অনেক বাহিরে। এই সীমা পার হইয়া যাইতে হইলে সদিয়াস্থিত এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব হইতে পাস্ না নিয়া যাইতে পারা যায় না। পাসের জন্য কাহাকেও বেশী সময় অপেক্ষা করিতে হয় না। একখানি ৫ পয়সা মূল্যের সরকারী কাগজে ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত দিলেই পাস্ পাওয়া যায় এই ॥৫ আনা প্রত্যেক যাত্রীকেই দিতে হয়। সাধু সন্ন্যাসীরাও ইহা এড়াইতে পারেন না। তারপর পরশুরাম যাতায়াতে যতদিন অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা, ততদিনের খাদ্যাদি সামগ্রী এই সদিয়া হইতেই কিনিয়া লইতে হইবে। পথিমধ্যে কেবল খামতি রাজধানী চৌখামে খাদ্য সামগ্রী কিনিতে পাওয়া

যায় বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই যে পাওয়া যায়, এ কথা বলিতে পারি না। সচরাচর সদিয়া হইতে পরশুরাম গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ১১।১২ দিন লাগিয়া থাকে। সদিয়াতেও মাড়ওয়ারীদিগের ঠাকুরবাড়ী কয়েকটী আছে। যাত্রীরা এই সকল দেবতাস্থানে থাকিতে পারে। যাঁহারা ভদ্রযাত্রী তাঁহারা পলিটীকেল আফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর বড়ুয়া প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীতে সাদরে স্থান পাইয়া থাকেন।

সদিয়া হইতে চৌখাম।

সদিয়া হইতে খামতি রাজধানী চৌখাম যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, তন্নিমিত্ত বন্দোবস্তও ভিন্ন ভিন্ন রকমে করিতে হয়। প্রথমতঃ সদিয়া হইতে পলিটিকেল আফিস দ্বারা হাতী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে দুই দিনে চৌখাম যাওয়া যাইতে পারে। তবে এই উপায়ে কেহ গিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু চেষ্টা করিলে যাইতে না পারিবার কোনও কারণ দেখি না। সদিয়া হইতে চূণপুড়া গারদ পর্য্যন্ত ১৬ মাইল সরকারী সড়ক আছে। চূণপুড়া সনার লাইনের উপর। ইহা ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। এখানে একজন হাওয়ালদার সহ কয়েকজন সৈনিক থাকে। এই স্থান হইতে নদী পার হইয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া ১৫।১৬ মাইল গেলে চৌখাম পৌছান যাইতে পারে। নদী পার হওয়া এবং ঐ জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়া যাওয়া অসুবিধাজনক ও বিপৎসঙ্কুল মনে করিয়া বোধ হয় এই পথে কেহ চলে না। তবে পূর্ব্বে খামতিরাজকে লিখিয়া একজন গার্ড সহ তাঁহার হাতী আনাইলে কোনও অসুবিধার সম্ভাবনা নাই। পলিটিকেল আফিস দ্বারা এই সকল বন্দোবস্ত করিতে হয়। তজ্জন্য সপ্তাহ বা দশদিন পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। হস্তীর ব্যয় ১৫৲।২০৲ টাকার অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ নৌকা করিয়া সদিয়া হইতে চৌখাম যাওয়া

যায়। সচরাচর নৌকাযোগেই যাত্রীরা চৌখাম গিয়া থাকে। নৌকার আকার অনুসারে পথ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; যদি নৌকা বড় হয় তবে উহা কেবল ব্রহ্মপুত্র নদ উজাইয়া চলিতে পারিবে। তাহা হইলে যাত্রী-দিগকে প্রায় ৪।৫ দিনে চৌখাম পৌঁছিতে হয়। স্রোত ঠেলিয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া যাইতে স্বভাবতই নৌকার গতি মন্দ হইয়া থাকে। তৎপর প্রায় অর্দ্ধ পথ গেলেই মধ্যে মধ্যে খরস্রোত প্রস্তর-সঙ্কুল বাঁধ পাওয়া যায়। বড় নৌকা ঠেলিয়া ঐ সকল বাঁধ পার হইতে বহু সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই নৌকা বরাবর চৌখাম পৌঁছে না, কেন না চৌখাম ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নহে। যাত্রীরা মিশমিঘাট নামক স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ৫ মাইল অরণ্যপথে চলিয়া চৌখাম পৌঁছে। কোনও কোনও বড় নৌকার যাত্রী সদিয়া হইতে নৌকা রওয়ানা করিয়া স্থলপথে চূণপুড়া গিয়া নৌকায় উঠে; ইহাতে দুই দিনের জন্য নৌকাপথের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু কষ্টকর পথ চূণপুড়ার পরে আরম্ভ হয়। যাহারা ছোট নৌকায় যাত্রা করে তাহারা ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া ১৩।১৪ মাইল আন্দাজ গিয়া নোয়াদিহিং নদীর মুখে প্রবেশ করিয়া টেঙ্গা-পানি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রাপ্ত হয়। এই নদীর তীরেই চৌখাম অবস্থিত। অতএব ক্ষুদ্র নৌকার যাত্রীরা বরাবরই চৌখাম পৌছিতে পারে। এই ক্ষুদ্র নদীতেও বাঁধ আছে। তবে এইগুলি ব্রহ্মপুত্র নদীর বাঁধের ন্যায় তেমন ভয়ানক নহে। বড় ছোট ভেদে নৌকার তারতম্য হয় কেন? ইহার কারণ আছে। পরশুরাম তীর্থযাত্রীরা প্রায়ই দরিদ্র, অধিকাংশই সাধু সন্ন্যাসী। তাহারা ৪০।৫০ জন একত্র হইয়া একখানি শতমোণী নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া তৎসাহায্যে সদিয়া হইতে চৌখাম অভিমুখে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য নৌকাতে তাহারা অবস্থান কমই করিয়া থাকে; নৌকা চলিতে থাকে, তাহারা ব্রহ্মপুত্রের

সিকতাময় চর (শুষ্ক গর্ভ) দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিতে থাকে। যদি ব্রহ্মপুত্রের চর দিয়া অবাধে চলা যাইত, তবে কেহ নৌকা করিত না। মধ্যে মধ্যে যখন চর শেষ হইয়া যায়, তীর ভাগের দুর্গমতা নিবন্ধন চলা যায় না, তখন যাত্রীদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে হয়। এবং অপর কূলে গিয়া পুনশ্চ চরে উঠিতে হয়। বড় নৌকাতে সদিয়া হইতে চৌথামের সন্নিকটস্থ মিশ্‌মিঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসার ব্যয় জন প্রতি ২৲ টাকা মাত্র লাগে। যাত্রীরা মিশ্‌মি-ঘাটে উঠিয়া চৌথাম হইয়া পরশুরাম গিয়া ফিরিয়া পুনশ্চ মিশ্‌মিঘাটে না আসা পর্য্যন্ত মাল্লা মাঝি ও নৌকা এই স্থানে অপেক্ষা করিবে। ক্ষুদ্র নৌকা অর্থাৎ সেই কুঁদা—৪।৫ জন মাত্র আরোহী লইয়া চলে। ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ত চর ভূমিতে আরোহীরা বড় নৌকার যাত্রীদের ন্যায় পাদচার করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের পর যখন নৌকা টেঙ্গাপানি নদী উজাইয়া যায় তখন তীর পাওয়া যায় না, তীরভূমি দুর্গম ও জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে কায়ক্লেশে নৌকাতেই বসিয়া থাকিতে হয়। অথচ প্রতিজনের যাতায়াতের ব্যয়—৫।৬ টাকা আন্দাজ পড়ে। বলা বাহুল্য যে নৌকা বড়ই হউক, ছোটই হউক— নদীর বাঁধ পার করিতে আরোহিগণ মাল্লাদিগকে সহায়তা করিয়া থাকে।

রাত্রিযাপন।

নৌকা যাত্রার রীতি এই যে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নদীর তীর সংলগ্ন চরে একটি পরিষ্কৃত স্থান দেখিয়া নৌকা লগ্ন করিতে হয়। সমস্ত যাত্রী আপন আপন জিনিষ পত্র সহ চরভূমিতে উঠিয়া রাত্রি যাপন করে। এমন কি নৌকাবাহী মাল্লারা পর্য্যন্ত নৌকায় থাকে না। যাত্রীগণ তীরে উঠিয়াই কাঠ, ডাল, পাতা সংগ্রহ করে, ডাল ও পাতা দিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ

করিতে হয়। কাঠ দ্বারা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শীত নিবারণার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়। ব্রহ্মপুত্রের চরভূমিতে পরিষ্কৃত স্থানের অভাব নাই। কাঠও প্রচুর মিলে। বড় বড় গাছ শাখা প্রশাখাসহ ব্রহ্মপুত্রের সৈকতে প্রোথিত হইয়া শুষ্ক হইয়া আছে। ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়া আনিলেই হইল তীরস্থ জঙ্গল হইতে কিছু পাতা ও ছোট ছোট ডাল আহরণ করিতে হয়। টেঙ্গাপানিতে ঢুকিলে যত্রতত্র অবস্থান করা যায় না। কাঠও যদৃচ্ছাভাবে পাওয়া যায় না। তাই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে শুষ্ককাঠ কিছু কিছু করিয়া আহরণ করা আবশ্যক, এবং যেখানে পরিষ্কৃত তীরভূমি পাওয়া যায়—সেখানে কিছু বেলা থাকিতেই নৌকা আটক করিতে হয়। এই অসুবিধার জন্যও অনেকে বড় নৌকায় কেবল ব্রহ্মপুত্র দিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এস্থলে একটি কথা বক্তব্য এই যে ছোট নৌকা গুলিকে শুধু ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে দেওয়া হয় না; চূণপুড়া গেলে গারদের সিপাহীরা নৌকা ফিরাইয়া দিবে। যাহা হউক রাত্রি যাপনার্থ পর্ণকুটীর নিৰ্ম্মাণ সর্ব্ব প্রথম কার্য্য; তৎপর অগ্নি প্রজ্বলন, তারপর সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া রন্ধন ও ভোজন, তৎপর শয়ন। কুটীর নিৰ্ম্মাণকার্য্যে কোনরূপ কৌশলের আবশ্যকতা নাই। দুইটি বড় বড় ডাল পুতিয়া অপর একটি ডাল প্রস্থে ঐ দুইটি ডালের উপর বাঁধিয়া কদলীপত্র কতকগুলি প্রস্থের ডালে ঠেকাইয়া দিলেই যে আচ্ছাদন একটি হইল, ইহাই রাত্রি যাপনার্থ প্রচুর মনে করা হয়। পাতা দিয়া তিন দিকে কোনরূপ ঢাকা হয়। যে দিকে খোলা থাকে সেই দিকে অগ্ন্যাধান পুরঃসর শয়ন করিতে হয়, নচেৎ শীতের প্রভাবে ঘুমান অসাধ্য। পরশুরামের পথের ক্লেশ এইখানে। যদিও পরশুরামের মাহাত্ম্যে বন্যজন্তুর ভয় এইখানে কেহ পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই—তথাপি পথক্লেশে রুগ্ণ হইয়া কুণ্ড দর্শন করিতে পারে নাই এইরূপ বহুলোকের সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে

শীত ঋতু ভিন্ন পরশুরামে কেহ যাইতে পারে না; অগ্রহায়ন হইতে বড়.জোর ফাল্গুন, এই কয় মাসই পরশুরাম যাত্রার সময়। অর্থাৎ যখন বৃষ্টি বাদলের সম্ভাবনা অল্প, অনাবৃত স্থানে পত্রমাত্রাচ্ছাদনে সারারাত্রি অগ্নি জ্বালিয়া থাকিতে কোনও বাধা জন্মিবার আশঙ্কা কম, তৎকালেই পরশুরাম যাইতে পারা যায়। কেবল নৌকায় চলিতেই যে এইরূপে রাত্রি যাপন করিতে হয় তাহা নহে। সদিয়া ছাড়িয়া পুনশ্চ সদিয়ায় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্থল পথেই চল, আর নৌকায়ই চল, প্রত্যহ রাত্রিতে এইরূপেই অবস্থান করিতে হইবে। পার্শ্বস্থ অগ্নি যখন নির্ব্বাণোন্মুখ হয়—তখন উঠিয়া পুনশ্চ কাষ্ঠাদি দানে উহা সংরক্ষিত করিতে হয়। এই নিমিত্ত কাহাকেও ডাকিয়া জাগাইতে হয় না, শীতপ্রভাবেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়। রাত্রির অবসানে সকলকেই প্রাতঃকৃত্য ও মধ্যাহ্নকৃত্য.এক সঙ্গে সমাধা করিয়া ফেলিতে হয়। বেলা ৭॥টা কি ৮টার পূর্ব্বে মাল্লারা নৌকা ছাড়ে না। আবার নৌকা ছাড়িবার পরে মাল্লাদের তামাকু সেবনার্থ কিংবা চা খাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অতি অল্প সময় বিশ্রাম করা ভিন্ন, নৌকার গতি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর স্থগিত হয় না। তাই স্নানাহার কার্য্যও প্রাতঃকালে সারিয়া ফেলিতে হয়। পরশুরামে এই পর্য্যন্ত বিলাসী বাবু কেহ গিয়াছেন কি না জানিনা, এই তীর্থ এখনও সাধুসন্ন্যাসীরই তীর্থ। গৃহস্থ যাহারা যায়, তাহারা শয়নে ভোজনে সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার উপরে কোন প্রকার কম্বলাদি বিছাইয়া পার্শ্বে ধুনী জ্বালিয়া শয়ন; আর আলুভাতে জ্বাল দিয়া—ঘৃত লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ, ইহাই ভোজন। সদিয়া হইতে আমি একাকী একখানা ছোট নৌকা ১৫৲ টাকা ভাড়া দিয়া আনিয়া ছিলাম, ইহাতে ইচ্ছানুরূপ শুইয়া বসিয়া নৌকাযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিলাম—তীরে উঠিয়া বেড়াইতে হয় নাই, বাঁধ পার করিতে জলে নামিয়া নৌকাও টানিতে হয় নাই। কাষ্ঠ সংগ্রহ কুটীর

নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও মাল্লারা তাহাদের একমাত্র আরোহী বলিয়া আমাকে যথোচিত সহায়তা করিতে পারিয়াছিল। সদিয়া হইতে চলিয়া দ্বিতীয় দিনে টেঙ্গাপানি নদীতে প্রবেশ করি, তৃতীয় দিন অপরাহ্লে চৌখামে পৌঁছি। সদিয়া হইতে চৌখাম জলপথে ৩০।৩৫ মাইলের উপর হইবে না।

চৌখাম।

খামতি জাতীয় রাজা "চৌখাম গোহাই" এইখানে বাস করিয়া থাকেন। খামতিরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ইহাদের পেষাক পরিচ্ছদ অনেকটা ব্রহ্মদেশীয়দের ন্যায়। রাজাঃ সঙ্গে আলাপ করিতে অসমীয়া ভাষা বা হিন্দি ভাষা বলিতে হয়। পরশুরাম ক্ষেত্র এই রাজার অধিকার ভুক্ত। সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলকেই রাজার সেলামী ২॥০টাকা দিতে হয়। তারপর যত জন কুলী চাই, ৫॥০ হিসাবে তাহাদের বেতনও রাজার নিকট অগ্রিম দাখিল করিতে হয়। এই ৫॥০ টাকায় কুলী পরশুরাম গিয়া পুনশ্চ যাত্রীকে লইয়া চৌখাম পৌছাইয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত একজন চৌকীদারও লাগে। তাহারও পারিশ্রমিক ৫॥০ টাকা। তবে দলবদ্ধ হইয়া গেলে চৌকীদার দলের সকলের প্রহরী স্বরূপ হইয়া যায়। এতদবস্থায় চৌকিদার বাবদে প্রায়শঃ কিছুই দিতে হয় না। দিতে হইলেও ভাগশঃ অতি অল্পই পড়ে। এখান হইতে পদব্রজে ভিন্ন পরশুরাম যাইবার আর উপায় নাই। তবে রাজার অনেক হাতী আছে। ঐগুলি প্রায়ই খেদাদি উপলক্ষে বাহিরে থাকে। দুই সপ্তাহ আন্দাজ পূর্ব্বে তাঁহাকে চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম দ্বারা (ঠিকানা—চৌসাং রাজা গোহাই, চৌখাম পোষ্ট বা টেলিগ্রাফ্ আফিস সদিয়া, আসাম) জানাইলে রাজা যতগুলির প্রয়োজন ততগুলি হাতী

চৌখামে আনাইয়া রাখেন। চৌখাম হইতে পরশুরাম যাতায়াতের নিমিত্ত প্রতি হাতীতে ২০৲ টাকা লাগিবে। এতদ্ভিন্ন মাহুত দৈনিক ॥০ হিসাবে নিবে। হাতী নিলে চৌকিদার বা অপর কুলী না নিলেও চলে। চৌখাম হইতে পরশুরাম ২৫ মাইল আন্দাজ হইবে, হাতী এক দিনেই ঐ পথ যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ শ্রম হইবে বলিয়া যাইতে ১॥ দিন লাগে, ফিরিয়া আসিতে এক দিনেই পারে।

চৌখামে মাড়োয়ারিদের ৫।৬ খানি দোকান আছে। তাহাতে ডাইল, চাউল, মসলা, কাপড়, মণিহারি জিনিস প্রভৃতি অত্যাবশ্যক অনেক বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু আলু ভিন্ন তরকারী, এবং পান সুপারি প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যায় না। মাড়ওয়ারিয়া এইখান হইতে মৃগনাভি, রবর, মোম, হাতীর দাত, মিশ্‌মিতিতা (অরণ্য মূল) প্রভৃতি চালান দিয়া থাকে; এইস্থানে ইহারা মহাবীরজীর একটি মন্দির স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু সদিয়ার ন্যায় যাত্রীদের থাকিবার কোনও "ঠাকুরবাড়ী" নাই; দেখিলাম তজ্জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে। রাজার কতকগুলি ঘর আছে বটে কিন্তু ঐগুলিতে কেহ বড় থাকে না; পালিত শূকরাদি কর্তৃক অপরিষ্কৃত থাকাই বোধ হয় ইহার কারণ। চৌখামে একটি বৌদ্ধমন্দির আছে। ইহার আকৃতি ব্রহ্মদেশীয় "পাগোদার" ন্যায়। মন্দিরে বুদ্ধ মূর্ত্তি ও ধর্ম্মগ্রন্থ বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। সম্মুখে একটি থালা আছে ইহাতে পরশুরাম যাত্রীরা যথাসাধ্য প্রণামী চড়াইয়া থাকে। ফুঙ্গীটি যুবক; পূর্ব্বনিবাস আসামেই ছিল; মন্দিরে একটি পাঠশালা আছে, ইহাতে খামতি ছেলেরা নিজ ভাষা ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় লেখাপড়া শিখে। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়ই ইহাদের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু "অসমীয় ভাষা অল্প অল্প শিক্ষা দিলে ছেলেরা ভবিষ্যতে লাভবান্ হইতে পারে" আমি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে ফুঙ্গী ইহা অনুমোদন

যোগ্য মনে করিলেন না। ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত। এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন বিষয় তাঁহার হস্তক্ষেপযোগ্য নহে। তবে ফুঙ্গী মহাশয়ের একবিষয়ে দেখিলাম বড় উৎসাহ। খামতিরা বড়ই অহিফেন ভক্ত। ইহা দ্বারা যে এই জাতির মহা অনিষ্ট হইতেছে, ফুঙ্গী ইহা বুঝিয়াছেন, এবং যাহাতে খামতিরা আফিং না খায়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিছুটা ফলও ফলিয়াছে বোধ হইল। স্বয়ং রাজা আফিং সেবন করিতেন, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; পূর্ব্বে চৌখামে আফিং এর দোকান ছিল এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

কুণ্ডাভিমুখে যাত্রা।

চৌখাম হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম পাঁচ মাইল একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তৎপর "কামলাংপানি" নামক এক নদীর চর ও গর্ভ এবং মধ্যে মধ্যে তীরভূমি দিয়া চলিতে হয়।

প্রথম দিন কামলাং পানি ধরিয়া পাঁচ মাইল গেলেপর নদীর চরে একটা পরিষ্কৃত জায়গায়, সেই দিনকার মত বিশ্রাম করা গেল। এই দিন নদী প্রায় ৫।৭ বার পার হইতে হইয়াছিল। জল বেশী নয় কিন্তু নদীগর্ভে নিমগ্ন প্রস্তরগুলি এত পিচ্ছিল যে পা উহার উপর টিকেনা। সৌভাগ্যবশতঃ নদীর স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া পাথরগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল, তাই সাধ্যমত শিলাগুলি এড়াইয়া পাদন্যাস করা গিয়াছিল, যেস্থানে পাথরে পা না দিয়া পারা যায় না, সেইখানে যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় আমাদের আশ্রয়ীভূত স্থানে দলে দলে যাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। রাত্রি যাপনের রীতি সেই পূর্ব্ববৎ, কুটীর নির্ম্মাণ ও

অগ্নি প্রজ্বালন নিমিত্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। নৌকা যাত্রায় যেমন মাল্লারা সাহায্য করিয়াছিল, স্থলপথে খামতি কুলীরাও সেইরূপ সাহায্য করিবে ভাবিয়াছিলাম; রাজাও তজ্জন্য কুলীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আড্ডায় পৌঁছিয়া দ্রব্যজাত ফেলিয়া দিয়া কুলীরা যে গেল পরদিন ৮টার পূর্ব্বে তাহাদের দেখাই পাওয়া গেল না। উহারা নিকটবর্ত্তী খামতি গ্রামে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। তবে আমার কিছু ত্রুটিও ছিল। খামতিরা বদ্ধ আফিংখোর; ⁄৴ আনা ।০ আনা আন্দাজ আফিং দিলে ক্রীতদাসের ন্যায় উহারা যাত্রীর সেবা করিয়া থাকে। তাই চতুর যাত্রীরা সদিয়া হইতে তোলা দুই আফিং নিয়া আসে। আমি ইহা জানিতাম, কিন্তু আফিং ঘুষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই। ভগবৎকৃপায় আমার কোনও অসুবিধাও ঘটে নাই। আমার নৌকার মাল্লাদের আত্মীয় দুইটি ডোমজাতীয় যুবক আমার সহযাত্রী হইয়াছিল। তাহারা আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

পরদিনের পর্য্যটন ক্লেশ একটু গুরুতর অনুভূত হইয়াছিল। নদী পারাপার হইতে যে টুকু অসুবিধা তাহা ত ছিলই, নদীর চ ভাগে বালুকার পরিবর্ত্তে ছোট ছোট এবং টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর মিলিতে লাগিল; ইহার উপর দিয়া নগ্নপদে পথচলা এক ভয়ানক ব্যাপার। অথচ বারংবার নদী পার হইতে হয়, তাই জুতাও পায়ে দেওয়া যায় না। আবার নদীর তীরভাগ দিয়া পথ চলিবার সময় শরবণ ভেদ করিয়া যাইতে হয়, উহার তীক্ষ্ণধার পত্রে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, পদতলও তীক্ষ্ণাগ্র কুশাঙ্কুর ও কণ্টক দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। এই ক্লেশের মধ্যে যখন পুরুষ সহযাত্রিগণের "বল বাবা পরশুরামজী কি জয়" এই ধ্বনি মুহুর্মুহু শুনা যায়,—যখন স্ত্রী সহযাত্রিগণের ক্লেশসহিষ্ণুতা দেখা যায় এবং তাহাদের আনন্দজনক হুলুধ্বনি ও গীতলহরী শ্রবণ করা যায় তখন হৃদয়ে উৎসাহের

এবং দেহে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ পথ চলিয়া ৭।৮ মাইল আসিয়া বেলা প্রহর পরিমাণ থাকিতেই সেই দিনের মত বিশ্রাম করিতে হইল। এই স্থান হইতে পরশুরাম ৮।৯ মাইল মাত্র, কিন্তু আর চলা যায় না। বিশেষতঃ ঐ স্থান ছাড়িলে পথে জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই এইথানেই রাত্রিযাপন করিতে হইল।

পরদিন বালেং নামক কটী সম্পূর্ণ শুষ্ক নদীর খাত ধরিয়া পথ চলিতে হইয়াছিল। পথে আর জল নাই জানিতে পারিয়া জুতা পায়ে দিয়া চলিলাম। কিন্তু এই দিনও প্রস্তরথণ্ড সমাকীর্ণ পথ চলিতে যে নগ্ন পদ সহযাত্রিগণের ক্লেশ হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইল। ৪।৫ মাইল এইরূপে চলিয়া উচ্চতর তীরভূমিতে প্রবেশ করা গেল। চৌথামের সন্নিকটস্থ ৫ মাইল পথের ন্যায় এই পথটিও অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রায় ৫ মাইল গিয়া কুণ্ডের তীরে পেঁ৷ছিয়াছে। আমরা প্রায় ১॥ টার সময় পরশুরামকুণ্ডে পেঁ৷ছিলাম। মাইল থানিক দূরে থাকিতেই একটা ঝাঙ্কৃতি শব্দ কর্ণ গোচর হইতেছিল। ঐ শব্দ কুণ্ডের অনতিদূরে পার্ব্বত্য ভূমি হইতে নিপতিত লৌহিত্য প্রবাহের এবং কুণ্ডের পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত ব্রহ্মকুণ্ডের জলধারার পতন শব্দ।

পরশুরাম কুণ্ড।

যাহা দেখিবার জন্য যাত্রিগণের এত ক্লেশ স্বীকার, সেই কুণ্ডের সমীপস্থ হইবামাত্র যেন সমস্ত ক্লেশের অবসান হইল। (এতৎসহ কুণ্ডের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল)। কুণ্ডে না আসা পর্য্যন্ত পথিমধ্যে কোনও উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয় নাই। কুণ্ডে পৌছিয়াই বোধ হইল, যেন চারিদিকে পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া গমন পথ আগুলিয়া রহিয়াছে।

কুণ্ডের তিন দিকে উচ্চ পাহাড় কেবল পূর্ব্বোত্তর কোণে লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের সলিল প্রবাহ। লৌহিত্য এই স্থানে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পরশুরাম কুণ্ডের জলে অভ্যুক্ষিত হইয়া "ব্রহ্মপুত্র" এই সংজ্ঞা ধারণ পূর্ব্বক খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। পরশুরামকুণ্ডকে কেহ কেহ 'ব্রহ্মকুণ্ড' বলে কিন্তু ইহা ঠিক নয়। ব্রহ্মকুণ্ড যে কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাই ভগবান্ পরশুরাম স্বীয় কুঠার দ্বারা পর্ব্বত গাত্রে দুইটি ছিদ্র করিয়া ব্রহ্ম কুণ্ডের জল পাতিত করিয়া "পরশুরামকুণ্ডের" সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহিত্য আসিয়া পরশুরামকুণ্ডস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছে। কুণ্ডের জল ব্রহ্মপুত্রের জলের ন্যায় নীলাভ। ইহার ব্যাস ৪০।৫০ হাত আন্দাজ হইবে। কুণ্ডে পতিত ব্রহ্মকুণ্ডের সলিল ধারা ৪ হাত অন্তর দুইটি ছিদ্র হইতে উদ্গত হইয়া ৭ হাত ব্যবধানে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে; তৎপর সেই মিলিত ধারা ৩০ হাত পরিমাণ পর্ব্বতগাত্র বহিয়া গিয়া আবার দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ১০ হাত পরিমাণ গিয়া ৩।৪ হাত উপর হইতে ত্রিধারায় কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। এই জলধারা প্রস্থে দুই হাতের বেশী কুত্রাপি হইবে না—গভীরতাও খুব কম। কুণ্ডের জল অতি শীতল, লোকে কুণ্ডে অবগাহন করিয়া প্রস্রবণ ধারার নীচে শরীর স্থাপন করে, তাহাতে ঐ জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ হয়। তাই কেহ কেহ ব্রহ্মকুণ্ডের জলধারাটিকে উষ্ণ-প্রস্রবণ মনে করে। বস্তুতঃ এই জলের তাপ স্বাভাবিক,—স্পর্শ করিলে কোনও উষ্ণতা অনুভূত হয় না। কুণ্ডের অতি শীতল জল স্পর্শে আড়ষ্ট শরীরে ইহার স্পর্শ অতি আরাম জনক এবং তুলনায় কবোষ্ণ বোধ হয়।

যাত্রীর সংখ্যা।

সন ১৩১৩ সালের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ্নে আমি কুণ্ডে পৌছি। একে পুণ্য সংক্রান্তির দিন, তাহাতে সোমবার অমবস্যা ও সূর্য্যগ্রহণ ; এই উপলক্ষে প্রায় ৫০০ শত যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। এত যাত্রী নাকি আর কখনও পরশুরামতীর্থে আইসে নাই। কুণ্ডে পৌছিবার প্রায় পোয়া মাইল দূর হইতেই পথের দুই পার্শ্বে যাত্রিগণের সন্নিবেশ দেখিলাম। সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা ১৫০এর ন্যূন হইবে না। অবশিষ্ট যাত্রিগণের অর্দ্ধাংশ স্ত্রীলোক। তীর্থপ্রিয় বাঙ্গালী অতি কমই দেখা গেল। মাড়ওয়ারী নেপালী, চা বাগানের কুলী ও অসমীয়া স্ত্রী পুরুষ—যাহারা লক্ষীমপুর জেলার অধিবাসী—ইহারাই সচরাচর পরশুরাম তীর্থে যায়। নচেৎ ইহা সাধু সন্ন্যাসীরই তীর্থ। বৰ্দ্ধমানবাসী জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ তদীয় একটি বিধবা আত্মীয়া সহ গিয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহারও কার্য্যস্থল আসামেই হইবে। সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে দুই জনের মাত্র বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিলাম। একজন কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে কার্য্য করিতেন, ম্যালেরিয়ার মারিফতে তাঁহার পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে "দেশে" পাঠাইয়া নিশ্চিন্তমনে অতিথিবেশ ধারণ করিয়াছেন ; অপর আজন্ম বিরাগী অল্পবয়স্ক যুবক। উভয়েই ব্রাহ্মণ, কয়েক দিন হইতে এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। সত্বরই স্ব স্ব গন্তব্যপথে যাইবার জন্য আবার পৃথক্ হইবেন। তখন "কা কস্য পরিবেদনা"। যেখানে জনমানবের বসতি নাই সেই কুণ্ডের তীরে এত জনতা হইয়াছে যে মাথা রাখিবার স্থান পাওয়া দুর্ঘট। কষ্টে সৃষ্টে কুণ্ডের পার্শ্বে একটু স্থান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। এই স্থানটি কুণ্ডের শীতল জলের সন্নিকট হওয়াতে তখনও অনধিকৃত ছিল।

দিগ্‌ভ্রম।

আমরা যখন কুণ্ডে পৌঁছি তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যায় সূর্য্যদেব কোন্ দিকে অস্তগত হইলেন দেখা যায় নাই। কুণ্ডের যে অংশটিতে বালুকাপূর্ণ চর পড়িয়াছে উহাই অবতরণ স্থান। ইহা কুণ্ডের পশ্চিমভাগে অবস্থিত কিন্তু দক্ষিণ ভাগে বলিয়া অনেকেই বলিল। রাত্রিকালে যখন মেঘাবরণ অপসৃত হইল তখন কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ঘাটটি যে পশ্চিম দিকে ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। যাত্রিগণের এই ভ্রম হইবার কারণ আছে। শীতকালে যখন সূর্য্য দক্ষিণায়ণে তখনই যাত্রীরা পরশুরাম গিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড় থাকায় সূর্য্যকে উদয় ও অস্তকালে প্রায়শঃ দেখা যায় না। যখন প্রায় ৫।৬ দণ্ডের সময় সূর্য্যদেব দেখা দেন তখন দক্ষিণের পাহাড়ের উপর দিয়া তাঁহাকে দেখা যায়। তখন সাধারণ লোকে ঐ দিকই পূর্ব্ব মনে করে; এবং পূর্ব্বদিক্ উত্তর মনে করে।

স্থান-মাহাত্ম্য।

কুণ্ডের তীরে আশ্রয় লাভ করিলাম বটে, কিন্তু জনতা নিবন্ধন কুটীর নির্ম্মাণের সরঞ্জাম এবং কাষ্ঠাদি পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল। উন্মুক্ত আকাশ তলেই সুতরাং শয্যা আস্তৃত হইল। কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছিল বটে কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল; তখন কার সাধ্য আগুন জ্বালায়? এই অবস্থায় কিরূপে রাত্রি যাপন হইবে তাহা বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বাতাসটি কুণ্ডের দিক্ হইতেই আসিতেছিল সুতরাং তুহিন শীতল কুণ্ডোদক

সংপৃক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইবারই কথা। প্রজ্বলিত অগ্নি পার্শ্বে রাখিয়া পর্ণ কুটীর তলে শয়ান হইলেও যে শীতবস্ত্র অপ্রচুর বোধ হইত, তদ্দ্বারা অনাবৃত শয্যায় অগ্নিবিহান অবস্থায় বাতাসের মধ্যে শুইয়া পরিণাম কি হইবে এই চিন্তায় নিদ্রা হইতেছিল না। কিন্তু সত্বরই সমস্ত ভয় ভাবনা দূর হইল; সন্ধ্যাকালে কতকটা শীত অনুভূত হইলেও রাত্রিতে উহার প্রভাব যেন ক্রমশঃ কম বোধ হইতে লাগিল। বাতাসটি যেন বসন্তের হাওয়ার ন্যায় সুখজনক বিবেচিত হইতে লাগিল। তখন ইহা তীর্থ-মাহাত্ম্যের ফল মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিকালে কোনও কিছু পর্ণকুটীরের বাহিরে থাকিলে, পরদিন উহা শিশিরে আর্দ্র হইয়া থাকিত; বাতাসের কৃপায় এই স্থানে কণামাত্রও শিশিরপাত হইল না।

তীর্থকৃত্য।

কুণ্ডের স্থানে কোনও পাণ্ডা নাই, কোন বিগ্রহও নাই। যাঁহারা এই থানে আসিয়া সমন্ত্রক স্নান তর্পণ করিতে চান, তাঁহারা হয় নিজে মন্ত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া আসিবেন, নয় মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আনিবেন; তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পার্ব্বণাদি করিতে হইলে তো কথাই নাই। সংক্রান্তির দিবস সোমবার অমাবস্যা তাই মৌনী অক্ষয়া ছিল বলিয়া অনেকেই প্রত্যূষে উঠিয়া কুণ্ডের বরফ তুল্য শীতল জলে অবগাহন করিতে লাগিল। তৎপর সূর্য্যগ্রহণের আরম্ভকালে এবং মোক্ষের সময় পুনশ্চ—এই দুইবার স্নান প্রায় সকলেই করিল। এত বড় যোগ অবশ্যই দান-দক্ষিণা হইবে ভাবিয়া একজন ব্রাহ্মণও দেখিলাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট হইতে পয়সা ইত্যাদি

আদায় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার দ্বারা কাহারও মন্ত্রপাঠের সহায়তা হইল না। কুণ্ডমধ্যে পয়সাদি সমস্ত যাত্রীই নিক্ষেপ করিল। প্রথমবারে স্নানকরিয়া কেহ কেহ আর্দ্র বস্ত্র কুণ্ডের তীরেই পরিত্যাগ করিয়া আসিল। ইহাই নাকি এই স্থানের নিয়ম। কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পয়সা ও পরিত্যক্ত বস্ত্র মিশ্‌মি জাতীয় নরনারীগণ কুড়াইতে লাগিল।

মিশ্‌মি জাতি

কুণ্ডের নিকটস্থ পাহাড়ের শিখরদেশে মিশ্‌মি জাতীয় লোকের বাস। এই সকল মিশ্‌মি পূর্ব্বকথিত "চলিকটা" শ্রেণীর মিশ্‌মি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর লোক। মিশ্‌মি জাতি তিনশ্রেণীর,—চলিকটা, দিজু, ও দিগারু। তন্মধ্যে চলিকটারা নামে মিশ্‌মি হইলেও ভাষায় এবং প্রকৃতিতে অন্য দুই শ্রেণীর মিশ্‌মি হইতে স্বতন্ত্র। দিজু ও দিগারু মিশ্‌মিদের ভাষাদিতে বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। কথিত আছে ভগবান্ পরশুরাম এই ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্রাহ্মণাদি সংস্থাপিত করিয়া যান। ইহারা "শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ," এবং পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে মিলিয়া মিশ্‌মিতে পরিণত হইয়াছে। "দিজু মিশ্‌মিরা" বোধ হয় "দ্বিজমিশ্র" এবং "দিগারুরা" "দ্বিজাবর"। "চলিকটারা" বোধ হয় "ভীস্‌মি" নামে এবং ইহারা "মিশ্‌ম্রি" নামে পরিচিত হইত। কালে উভয়টা মিশিয়া "মিশ্‌মি" এই সংজ্ঞা হওয়াতে দুইটা স্বতন্ত্রজাতির সমসংজ্ঞা হইল। যাহা হউক এখনও এই প্রবাদ যে পরশুরাম তীর্থে আসিয়া মিশ্‌মিদিগকে পয়সাদি প্রদান করিতে হয়। মিশ্‌মিরাও জনতার আঁচ পাইয়া যাত্রিগণ হইতে দান গ্রহণার্থ বেশ একদল কুণ্ড স্থলে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কাঠ বেচিয়াও অনেকে দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল।

দেওকুশ দেওমণি দেওআলু দেওপানি ইত্যাদি।

পরশুরাম যাত্রীরা এত কষ্ট করিয়া তীর্থে আইসে, বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তীর্থের নিদর্শন একটা কিছু নিয়া যাইবার জন্য সুতরাং ব্যগ্র হয়। পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এক প্রকার ঘাসের মত তৃণ "দেওকুশ" (দেবকুশ) নামে অভিহিত হয়। কুশের কার্য্য ইহা দ্বারাই চলে। ইহার মঞ্জরীতে একপ্রকার ফল হয়,—কাঁচা অবস্থায় ঠিক ক্ষুদ্র বদরীর ন্যায় দেখায়। পাকিলে ইহার ত্বক্ নীলবর্ণ হয়। ত্বক্ ছাড়াইলে ভিতরের শাঁস ঠিক মণির মত দেখায়, এই ফলের নাম দেওমণি। ভক্তেরা ইহা সচ্ছিদ্র করিয়া রুদ্রাক্ষের ন্যায় ব্যবহার করে। দেওআলু ঐ স্থানেই পাহাড়ে উৎপন্ন আলুরই ন্যায় পদার্থ; কাঁচা খাইতে পারা যায়, কিন্তু বিশেষ কোনও স্বাদ নাই। শুষ্ক আলুগুলির আকার বড় মোনাক্কার মত। তখন ইহার কাল নয়, সুতরাং আমরা কতগুলি শুষ্ক আলু মাত্র পাইয়াছিলাম। দেওমণি দেওআলু পয়সায় ৩।৪টা করিয়া মিশ্‌মিরা বেচিয়াছে। দেওকুশ ঐ ক্ষেত্রে যথেষ্ট জন্মায়, তুলিয়া লইলেই হইল। দেওমণিও পাওয়া যাইত কিন্তু মিশ্‌মিরা লাভের আশায় পূর্ব্ব হইতেই ঐগুলি সংগৃহীত করিয়া লইয়াছিল; তবুও অপক্ক ফল দুই একটি যে পাওয়া না গিয়াছে তাহা নহে। দেওপানি কুণ্ডে পতিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল ধারা; যাত্রীরা বাঁশের চোঙ্গা ভরিয়া এই পবিত্র জল সঙ্গে করিয়া নিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ 'কুণ্ডের' চরভাগ হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া নিয়াছে, আমি উহার "দেওমাটী" নাম প্রদান করিয়াছিলাম।

পরশুরামাষ্টক।

পরশুরামকুণ্ডে স্নানতর্পণাদি করিবার সময়ে অবশ্যই সেই ভগবদবতার ক্ষত্রিয়-শোণিতে পিতৃতর্পণকারী ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল; ভাবপ্রবাহে

আরও কত কি মনে আসিল, তাহা আর কি বলিব? পরশুরামের কোনও স্তোত্র জানিনা, ভাবাবেশে যাহা বিরচিত হইয়াছিল, তাহাই পড়িতে লাগিলাম :—

নমঃ পরশুরামায় নমঃ কুঠারপাণয়ে।
নমোঽস্তু জামদগ্ন্যায় ক্ষত্রকুলদবাগ্নয়ে ॥ ১
নমঃ শঙ্করশিষ্যায় ক্রৌঞ্চ-দারণ-শক্তয়ে।
নমোঽমিতপ্রভাবায় নমো ঘোরতপস্বিনে ॥ ২
নমঃ পিতুর্নিয়োগেন মাতৃভ্রাতৃ শিরশ্ছিদে।
নমস্তাতপ্রসাদেন তেষামুজ্জীবকারিণে ॥ ৩
নমো হোমগবীবৎসহারিহৈহয়শাসিনে।
নম স্ত্রিসপ্তকৃত্বশ্চ ক্ষত্রাসৃক্ পিতৃতর্পিণে ॥ ৪ ॥
নমঃসসাগরাং পৃথ্বীং কশ্যপায় প্রযচ্ছতে।
নমোঽস্তু ভোগবৈমুখ্যাৎ তীর্থভ্রমণশালিনে ॥ ৫
নমো জীববিমোক্ষায় ব্রহ্মকুণ্ড প্রদর্শিনে।
নমঃ কুঠার-ঘাতেন ব্রহ্মপুত্র প্রবর্ত্তিনে ॥ ৬
নমঃ কঠোর কৃত্যায় নমো ভূভার-হারিণে।
নমো রজস্তমোহন্ত্রে নমঃ সত্ত্ববিকাশিনে ॥ ৭
নমো জনকভক্তায় নমোঽস্তু চিরজীবিনে।
নমো বিষ্ণ্বতারায় ভার্গবায় নমো নমঃ ॥ ৮
কৃতং শ্রীপর্শুরামস্যমাহাত্ম্যমুগ্ধচেতসা।
প্রণামাষ্টকমেতদ্ধি ভবতু প্রীতয়ে হরেঃ ॥

ঐ সঙ্গে কুণ্ডেরও একটি প্রণাম মন্ত্র পঠিত হইল :—

নমস্তে পরশুরামকুণ্ডায় মোক্ষদায়িনে।
স্নানাদিকং করোম্যত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়েঽস্তু তৎ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

পরদিন অর্থাৎ ১লা মাঘ (১৩১৩) প্রাতঃকাল হইতেই হাট ভাঙ্গিতে লাগি৽.। বেলা নয়টার মধ্যে জনাকীর্ণ স্থান বিজন বনভূমিতে পরিণত হইল। ইহাই কুণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা। ইচ্ছা ছিল কিয়ৎকাল নির্জ্জনে কুণ্ডের কাছে অবস্থান করি ; কিন্তু সহযাত্রীদের নির্ব্বন্ধে তাহা পারিলাম না। অনিচ্ছার সহিত কুণ্ডের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল, জীবনে আর কি এই কুণ্ডদর্শন ঘটিবে ? প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখিলাম, আমরাই ফেরত যাত্রীর শেষ দল। ফিরিবার সময়ে পথ পরিচিত সুতরাং আমরা চৌকিদার বা কুলিদের উপর নির্ভর না করিয়া সবেগে পথ চলিতে লাগিলাম। দুই দিনে যে পথ আসিয়াছিলাম, তাহা একদিনেই অতিক্রম করিলাম। পর দিন মধ্যাহ্নে চৌথাম পৌছিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিয়াই নৌকায় উঠিলাম।

রাস্তানির্ম্মাণ।

রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কালে পথের কথা তুলিয়াছিলাম। রাজা ইচ্ছা করিলে নদীর তীর ভাগ দিয়া বেশ একটি পথ করিয়া দিতে পারেন, এইকথা বলাতে তিনি বলিলেন "আমি নামে রাজা ; কিন্তু অর্থহীন। রাস্তা নির্ম্মাণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার কথা।" ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে উপর আসামের এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার রাও সাহেব মাতাদীন শুকুল বাহাদুর পরশুরাম কুণ্ডে গিয়া পথনির্ম্মাণবিষয়ক একটি প্রস্তাব

আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। কুণ্ডদর্শনের কিয়দ্দিন পরেই এই ক্ষুদ্র লেখকের "পরশুরাম তীর্থযাত্রীর দিনলিপি" শীর্ষক একটি ইংরেজী প্রবন্ধ অমৃত-বাজার-পত্রিকায় এবং শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব্ব উইক্লি ক্রণিক্‌লপত্রে প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকাকারে সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া শ্রীহট্টের উকিল সরকার মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর পরশুরাম কুণ্ডের যাত্রিগণের পথ-ক্লেশ যাহাতে দূরীভূত হয়—তজ্জন্য সদিয়া হইতে চুণপুড়া গারদ দিয়া চৌথাম হইয়া পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত একটি রাস্তা এবং তৎসঙ্গে যাত্রীদের বাস সৌকর্য্যার্থে কয়েকটি সরাইখানা নিম্মাণের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট সমীপে অনুরোধলিপি প্রদান করিয়াছিলেন।

মহামান্য গবর্ণমেণ্ট্ এ বিষয়ে অবধানপরায়ণ হইয়া তদন্ত করাইয়া অবগত হন যে এই রাস্তা নির্ম্মাণ করিলে কেবল যে তীর্থযাত্রিগণের সুবিধা হইবে এমন নহে; ইহার দ্বারা বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি তথা রাজনীতিক বহু সুবিধা হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা। তাই স্থির হইল যে সদিয়া হইতে চূণপুড়া (বা সোনপুরা—বর্ত্তমানে সরকারি নাম ইহাই দাঁড়াইয়াছে) যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তার লাভ করিয়া চীনসাম্রাজ্যের প্রান্তস্থ রিমা নামক স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারে। দুই বৎসরের মধ্যেই ঐ রাস্তা তৈয়ার হইয়া গেল; উহা চৌথাম দিয়া না গিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিয়া নির্ম্মিত হইল। এই পথের মধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রামশালা সংস্থাপিত হইল—তন্মধ্যে চূণপোড়া হইতে ৩২ মাইল (এবং সদিয়া হইতে প্রায় ৫০ মাইল) দূরবর্ত্তী টেমাইমুখ নামক ষ্টেশনটি পরশুরাম হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরবর্ত্তী; তথা হইতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আরণ্যপথে লোকজন অনায়াসে পরশুরামকুণ্ডে গিয়া স্নানাদি সমাপন

পূর্ব্বক স্বল্পকাল মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। তাই পরশুরাম যাত্রীর পথক্লেশ বহু পরিমাণে কমিয়া গেল।

কিন্তু ইহাতে সত্বরই এক অন্তরায় আসিয়া অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইল। খৃঃ ১৯১১ অব্দের শেষভাগে আবোরদের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুর অভিযান প্রেরণ করিলেন। তাহার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ইহাতে গবর্ণমেন্ট্ রিমার রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া চূণপোড়া হইতে উত্তর দিকে নূতন পথ চীনরাজ্যের প্রান্তস্থিত ওয়ালং নামক স্থান অভিমুখে সম্প্রতি তৈয়ার করাইতেছেন। অতএব পরশুরাম তীর্থ পূর্ব্ববৎ দুর্গমই থাকিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

পরন্তু ভগবদিচ্ছায় ইহারও প্রতীকার আশুই হইয়া গিয়াছে। গৌহাটিস্থিত সনাতন ধর্ম্মসভা এই সংবাদ পাইবামাত্র মহামান্য চিফ্-কমিশ্নার সার আর্চডেল্ আর্ল কে, সি, আই, ই, বাহাদুর সমীপে বহুজন স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক রিমার দিকের টেমাইমুখ পর্য্যন্ত পথটি পরশুরামতীর্থ যাত্রীর সুবিধার জন্য বজায় রাখিতে প্রার্থনা করেন; আসামের অন্যান্য স্থানের ধর্ম্মসভা হইতেও এই প্রার্থনার সমর্থক আবেদন পত্র আসাম গবর্ণমেন্ট্ সমীপে প্রেরিত হয়। তাহাতে সদাশয় চিফ্ কমিশনার বাহাদুর টেমাইমুখ পর্য্যন্ত পথ অব্যাহত থাকিবে বলিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছেন। অপিচ টেমাইমুখ হইতে লৌহিত্য পার হইয়া পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা সন সন পরিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কুণ্ডের সন্নিকটে একটি সরাইখানা তৈয়ার করিয়া দিবেন, এবং খেয়ার নিমিত্তে খাম্তিরাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় এবার পরশুরামের পথের দুর্গমতা চিরতরে দূরীভূত হইল এখন যে

কেহ ইচ্ছা করিলে সদিয়া দিয়া পদব্রজে বা গোশকটে টেমাইমুখ পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইবে। তৎপর ব্রহ্মপুত্র খেয়ায় পার হইয়া অনধিক তিন মাইল মাত্র সামান্য আরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া কুণ্ডে গিয়া অবস্থান করিবার গৃহও প্রাপ্ত হইবে এবং এই সুখ সুবিধার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্‌কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিবে। (এতৎসহ এই নূতন পথের পরিচারক একটি নক্‌শা প্রদত্ত হইল।)

পরশুরাম কুণ্ড সম্পূর্ণ

সাদিয়া
হইতে
পরশুরাম কুণ্ড
ওয়ালং পর্য্যন্ত
টিডিং নদী
প্রকা
পরশুরাম কুণ্ড
সাদিয়া
সৌখোয়া ঘাট
ব্রহ্মপুত্র নদী
তিজু নদী
উ

বদরিকাশ্রম।

কৈলাস পর্ব্বত
মানস সরোবর
কেদার
বদরী
শ্রীনগর
আলমোরা
নেপাল
রাম নগর
বরেলি
বদরিকার পথের
মান চিত্র

বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ।

—— ০ঃ৯ঃ০ ——
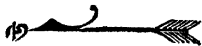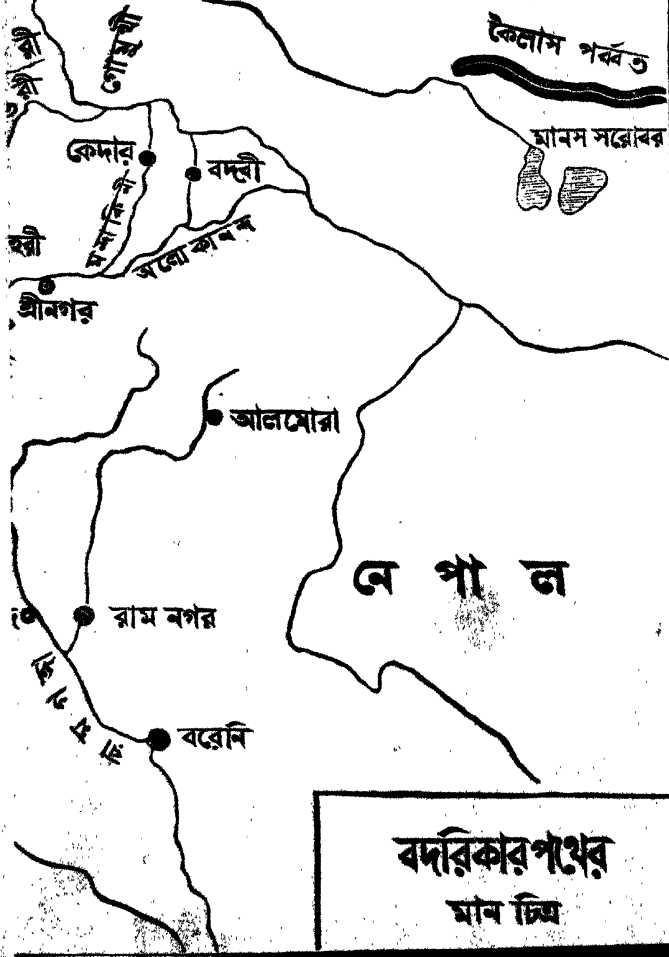
ভূমিকা।

এখন তীর্থ-ভ্রমণ ব্যাপার সুগম হইয়া পড়িয়াছে। রেলওয়ে ও ষ্টীমারযোগে যখন যেখানে ইচ্ছা অচিরকালমধ্যে চলিয়া যাইতেছি। আজ কালীঘাটে, কাল বারাণসীতে, পরশু প্রয়াগে, তৎপর দিন বৃন্দাবনে যাইতে সমর্থ হইতেছি। ইহাতে দেবতা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি বটে; কিন্তু তীর্থপর্য্যটনের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতেছি কি না, তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। তীর্থমাহাত্ম্যে আছে;—

"পদ্ভ্যাং গচ্ছেন্নবৈ যানে যদীচ্ছেদ্ধর্ম্মমুত্তমম্"

ফলতঃ তীর্থ দর্শনও এক তপস্যা বিশেষ; অশ্বযান, গোযান বা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক আরাম করিয়া চলিলে উদ্দিষ্ট তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি তেমন একটা আন্তরিক আবেগ জন্মে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, পূর্ব্বে যাহারা হাঁটিয়া পুরীধামে যাইত তাহারা যেমন প্রতি পাদবিক্ষেপে জগন্নাথকে স্মরণ করিত, এখন যাহারা রেলে চড়িয়া যায়, তাহারা কি তেমন ব্যাকুলতা সহকারে তাঁহার কথা ভাবে?

এবম্প্রকারে তীর্থপর্য্যটন করিলে দেশ ভ্রমণেরও সম্পূর্ণ ফললাভ ঘটে না। রেলে চড়িয়া বায়ুবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিলে অতিক্রান্ত ভূভাগের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই জন্মিতে পারে।

কিন্তু সকল তীর্থই সুগম হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। পরশু-রামক্ষেত্র কিংবা উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে হইলে রেলওয়ে যোগে

অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায় বটে কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হইলে অনেকটা পথ যাত্রীকে চলিয়া যাইতে হয়।

আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল পরশুরাম কুণ্ড দর্শন করিয়াছিলাম। তৎপর হইতেই উত্তরাখণ্ডে বদরীনারায়ণ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যৌবনের মধ্যাহ্ন কাল অতীতপ্রায়, সত্বরই শরীর ভ্রমণক্লেশ সহনে অপটু হইয়া পড়িবে, এই ভাবনায় সেই আগ্রহের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। নারায়ণের কৃপায় এইবার মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

পথঘাটের পরিচয়ের জন্য শ্রীযুত জলধর সেন কৃত "হিমালয়" নামক গ্রন্থ এবং রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত 'উদ্বোধন' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় গত বর্ষে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। জলধর বাবু কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে হৃষীকেশ হইতে বরাবর বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন। তদীয় পুস্তকখানি উপাদেয় হইলেও ইতি মধ্যে বদরীর পথের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু উদ্বোধন পত্রিকার প্রবন্ধটী সংক্ষিপ্ত হইলেও, লেখক মাত্র পাচ বৎসর হইল কেদারনাথ দর্শন পূর্ব্বক বদরীনারায়ণ গমন করাতে, ইহা দ্বারা পথ-পরিচয়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে, এই ব্যক্তি যে পথে পর্য্যটন করিয়াছেন, ইদানীং সেই পথেরও অনেকটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

পরশুরাম একাকী গিয়াছিলাম—বদরিকাশ্রমেও একাকী যাইব মনে ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় সৎসঙ্গেরই লাভ হইল। শ্রীযুত গৌরাঙ্গপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ মুঙ্গের সহরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন—কুলীন ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় ৩৫—আজও বিবাহ করেন নাই, করিবেনও না। পরম বৈষ্ণব, পরোপকারে প্রবণচিত্ত, নিরামিষাশী স্বহস্তে পাক না করিয়া অন্নগ্রহণ করেন না। তিনিও সঙ্গী খুঁজিতে-

ছিলেন। আমারই সৌভাগ্য, কোনও বিশিষ্ট বন্ধুর উদ্যোগে বারাণসীতে আমাদের মিলন হইল। ১৩১৭ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে উভয়ে পাঞ্জাব মেলে হরিদ্বার অভিমুখে রোয়ানা হইলাম।

হরিদ্বার।

পরদিন ২৬শে বৈশাখ সোমবার অমাবস্যা মৌনী অক্ষয়া, হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিয়া বদরিকা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। সত্বরই বদরীনাথ ও কেদারনাথের পাণ্ডা ঠিক হইল; উঁহাদের নিযুক্ত একজন গোমস্তা ব্রাহ্মণ আমাদের সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক রূপে যাইবেন। আমাদের জিনিষ পত্র বহনার্থ একজন কাণ্ডীওয়ালাও নিযুক্ত হইল; কিন্তু পাকা বন্দোবস্ত হইল না, তাহা পরে হইয়াছিল। এখান হইতে যাত্রীরা গিরিপথ ভ্রমণের সহায় বংশযষ্টি এবং আবশ্যক মত শীতবস্ত্র, পাকের বাসন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া থাকে। এখান হইতে সঙ্গী মহাশয় গেরুয়া রঙ্গের ধুতি কামিজ ও চাদর পরিধান করিলেন; আমি গৃহী হইয়া "ভগবদ্বস্ত্র" ব্যবহার করা সঙ্গত মনে না করাতে তাঁহার 'সমবেশ' হইতে পারিলাম না। তাঁহাকে তদবধি "স্বামীজী" সংজ্ঞা প্রদান করিলাম। গোমস্তা এবং কাণ্ডীওয়ালাও ঐ নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিত। হরিদ্বারে আমরা উভয়েই পূর্ব্বে এক একবার আসিয়াছিলাম, তাই এখানে কালক্ষেপণ অনাবশ্যক মনে করিলাম।

পর্য্যটনের প্রথম দিবস

২৭শে বৈশাখ মঙ্গলবার,

হৃষীকেশ ও লক্ষ্মণ ঝোলা।

পরদিন আটটার সময় দেরাদুনগামী ট্রেণে চড়িয়া ৬ মাইল গিয়া হৃষীকেশ রোড ষ্টেশনে (ওরফে রাইওয়ালায়) অবতরণ করিলাম। তথা হইতে আমাদের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হইল।

এই রেল ষ্টেশন হইতে মাইল খানিক পথ চলিয়া সত্যনারায়ণের মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি যেমন সুন্দর, ভিতরকার মূর্ত্তিগুলিও তেমনই মনোহর। নারায়ণ লক্ষ্মী সহ সিংহাসনে বিরাজমান, নিম্নে গণেশ, গরুড় ও হনুমান্। এখানে ধর্ম্মশালা এবং অনেক মিষ্টান্নের দোকান আছে। বহু যাত্রী এখানেই মাধ্যাহ্নিক স্নানাহার সম্পাদন করিল। আমরা হৃষীকেশ অভিমুখে চলিলাম। পথে মাইল দুই মাইল অন্তর অন্তর বিশ্রামার্থ ধর্ম্মশালা ছিল; আমরা বরাবর প্রায় ৭ মাইল চলিয়া হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গায় স্নান ও তর্পণাদি সম্পাদন করিলাম। হৃষীকেশ হরিদ্বার হইতে চৌদ্দ মাইল। যাহারা রেলে হৃষীকেশ রোড্ ষ্টেশনে আসে না, তাহারা পথে ভীমেশ্বর মহাদেব ও ভীমকুণ্ড দেখিয়া সত্যনারায়ণে আইসে। হৃষীকেশে বহু ধর্ম্মশালা আছে; কিন্তু আমরা পাক করিয়া খাইবার নিমিত্ত একটু সুবিধাজনক স্থান বহুচেষ্টাতেও পাইলাম না। কেন না, যাত্রীর বড় ভিড়; যাহারা বদরীনারায়ণ যাইবে না, এমনও অনেকে হৃষীকেশ ও লক্ষ্মণঝোলা পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া যায়। হৃষীকেশে রামচন্দ্রের ও ভরতের মন্দির আছে। রামচন্দ্রের মন্দিরের সাক্ষাতে একটি কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকে। এই কুণ্ডের নাম কেহ বলে কুব্জাকুণ্ড, কেহ বলে ঋষিকুণ্ড।
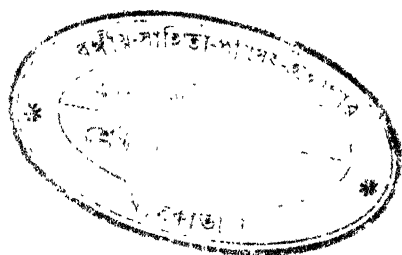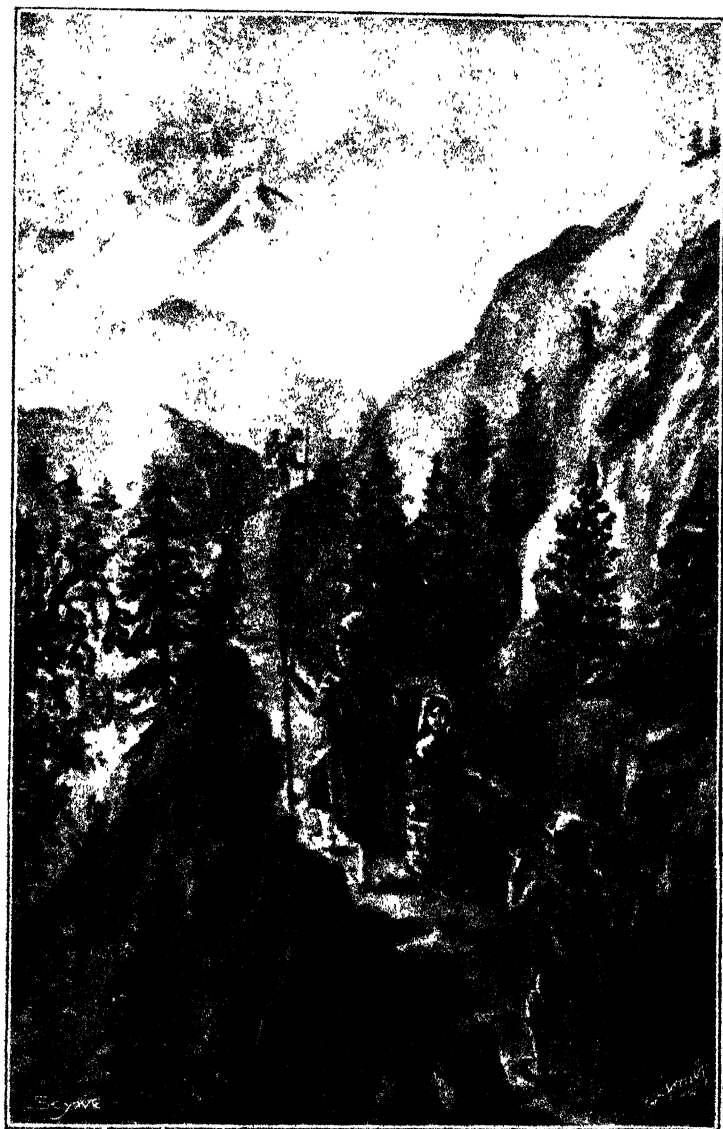
হৃষীকেশে ভাগীরথীর পবিত্র তীরভূমিতে ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। আমরা যখন হৃষীকেশ হইতে লক্ষ্মণঝোলার পথে চলিতে লাগিলাম তখন অল্পদূরে গঙ্গার ধারে অনেক পর্ণশালা আমাদের নয়নগোচর হইল, দুই একজন কমণ্ডলুধারী সাধুর দর্শন লাভও ঘটিল। আমরা লক্ষ্মণঝোলার পথে প্রায় ১॥ মাইল চলিয়া পাহাড়ের পাদদেশে শত্রুঘ্নের মন্দিরের কাছে আসিলাম। ঐখানে তিহরিরাজের কতকগুলি কর্ম্মচারী থাকেন, উঁহারা ঝাপান ও কাণ্ডীর ভাড়া নির্দ্দেশ করিয়া সেই বাবদে কর আদায় করিয়া যাত্রীদিগকে রসিদ দিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতেও কাণ্ডী বা ঝাপানওয়ালা নিযুক্ত করা যায় বটে, কিন্তু এই স্থানে আসিয়া ভাড়াদি নিরূপিত হয়।

নরবাহী ঝাপান ও কাণ্ডীর ভাড়া আরোহীর শরীরের পরিমাণ দেখিয়া সাব্যস্ত হয়। আমি কাণ্ডীর অযোগ্য ছিলাম; কেন না কৃশাঙ্গ ব্যতীত কাণ্ডীতে সুবিধা হয় না, বাহক নিতে চায় না। কাণ্ডী প্রায় খাসিয়াদের থাবার ন্যায়, তবে কিছু ছোট। মানুষ ও মালপত্র উভয়ই এই কাণ্ডীদ্বারা বহন করে। এক জন লোক উহা পিঠে করিয়া লইয়া যায়। ঝাপান পাহাড়ীদের চতুর্দ্দোল, কিন্তু হঠাৎ দেখিতে আমাদের দেশের শববাহক দোলার মত,—শব শুইয়া থাকে, ঝাপানের আরোহী আসন করিয়া বসিয়া থাকে—এই প্রভেদ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবশ্য আরও প্রভেদ দেখা যাইবে; তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, চিত্র দেখিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাকে ঝাপানে চড়িতে হইলে প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কিনিতে হইত।

রাজার প্রাপ্যকর ঝাপান বা কাণ্ডীর বাহকগণের প্রাপ্য হইতে আদায় হইয়া থাকে। তদর্থে যাত্রীদিগকে ভাড়ার এক চতুর্থাংশ অগ্রিম দিতে হয়।

নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ছাড়া ঝাপন ও কাণ্ডীবাহকদিগকে নিম্নলিখিতানুরূপ পুরস্কার দিতে হয়।

(১) দৈনিক প্রত্যেককে দুই পয়সা করিয়া জলপানি।

(২) কেদার বদরী যাত্রীদিগকে কেদারনাথ, বদরীনাথ ও ত্রিযুগীনারায়ণ এই তিন তীর্থে বাহকদিগকে এক সের করিয়া খিচুড়ী, অথবা তন্মূল্য।

(৩) যদি কোনও দিন কোনও স্থানে বিশ্রাম করা হয় অর্থাৎ যদি পথ চলা না হয়, তবে ঐ দিন বাহককে এক সের করিয়া আটা বা তন্মূল্য।

(৪) যাত্রা শেষ হইলে বাহক প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া অতিরিক্ত পুরস্কার।

এই গুলির কথা রাজকর্ম্মচারিপ্রদত্ত রসীদে স্পষ্ট লেখা থাকে। এ ছাড়া রসীদ দাতাকে ৷৷০ আনা “ভালমানুষী” দিতে হয়, রসীদে ইহার উল্লেখ থাকে না। ইহা কি, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমি ইহা দিতে অসম্মত ছিলাম; আমার সঙ্গী ডাক্তার বাবুও উহা দিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে যখন উহারা, এই পয়সা আমরা না দিলেও পারি, ইহা স্বীকার করিল, তখন কোমল হৃদয় ডাক্তার বাবু তাহা দিয়া ফেলিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হরিদ্বার হইতেই আমরা একজন কাণ্ডী-ওয়ালা আনিয়াছিলাম। এখানে আমাদের জিনিসপত্র ওজন করিয়া ভাড়া সাব্যস্ত হইলে পর, সেই কাণ্ডীওয়ালা অন্য একজন ব্যক্তিকে তাহার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া উহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ আদায় করিয়া লইল, আমরাও কিছু দিলাম।

একটি বিষয় এখানে বলিবার আছে। ভাড়ার তালিকায় তিন

রকম যাত্রীর উল্লেখ আছে। (১) গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন যাহারা করে, তাহারা দেবপ্রয়াগ হইয়া তিহরি (৩৩ মাইল) যায়। তৎপর সেখান হইতে প্রথমতঃ ধারাসু নামক স্থান দিয়া যমুনোত্তরী যায়, তারপর উত্তর কাশী (ওরফে বারহাট) আসিয়া গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইসে। ফিরিবার সময়ে মসুরী দিয়া দেরাডুন আসিয়া রেল ধরিতে পারে। কেহ কেহ হরিদ্বার হইতে বরাবর রেলে দেরাডুন গিয়া সেইখান হইতে কাণ্ডীওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী দেখিয়া ঐ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। তিহরি হইতে ধারাসু ৩৫ মাইল তথা হইতে যমুনোত্তরী ৪০ মাইল, উত্তরকাশী ১৮ মাইল। উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্তরী ৫৭ মাইল। গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল।

(২) যাহারা কেদার ও বদরী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাদের মধ্যে কেবল পঞ্জাবের যাত্রীরা ফিরিয়া হরিদ্বার আসিয়া রেল ধরে; নচেৎ অন্যান্য প্রদেশ বাসীরা কেদার বদরী দর্শনান্তে রামনগর গিয়া রোহিলাখণ্ড কুমায়ুন রেলে চড়িয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করে। ইহাদের যান বাহনাদি মৈলচৌড়ি নামক গাড়োয়াল ও আলমোড়া জিলার প্রান্তস্থিত স্থান পর্য্যন্ত ইহাদিগকে পৌছাইয়া দেয়।

(৩) যাহারা সকল তীর্থ দর্শন করে তাহাদিগকে প্রথমবিধ যাত্রীদের ন্যায় যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী দর্শন পূর্ব্বক গঙ্গোত্তরীর পথে (৩৯ মাইল) ভাটোয়ারী নামক স্থানে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিযুগী নারায়ণ হইয়া কেদার নাথে যাইতে হয়; তৎপর দ্বিতীয় বিধ যাত্রীদের ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। কেননা এইরূপ পর্য্যটনে প্রায় দুইমাস কাল লাগিয়া থাকে। আবার ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণের পথ (৬৫ মাইল) অত্যন্ত কঠিন, যাত্রীদের অবস্থান ও

আহারাদি করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত চটিও নাকি পাওয়া যায় না। রাস্তাও সড়ক নহে, পাকদণ্ডী অর্থাৎ পার্ব্বত্য ঝাঁড়ি পথ মাত্র; শীত ভয়ানক। প্রবন্ধের প্রারম্ভে একটি মানচিত্র প্রদত্ত হইল, ইহার দ্বারা অন্ততঃ প্রধান প্রধান তীর্থ গুলির দিঙ্ নির্দ্দেশ হইতে পারিবে।

আমরা নিজের জন্য কোনও বাহনের বন্দোবস্ত না করিলেও জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, পথে যে কোনও চটিতে ঝাপান ও কাণ্ডীওয়ালা পাওয়া যায়। তবে দর দস্তুর করার সময়ে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, নিযুক্ত বাহকদের কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলে তৎস্থলে লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যাত্রীকে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। বাহকেরাই অন্যলোক যোগাইয়া দিয়া থাকে এবং পরিভ্রমণের অবসানে বদলীওয়ালাকেই বাকী টাকা পয়সা দিতে হয়।

এই ঝাপান ও কাণ্ডীবাহকেরা গাড়োয়ালের লোক, গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী কেদার বদরী প্রভৃতি এই গাড়োয়ালেরই (পুরাণমতে কেদার খণ্ডের) অন্তর্গত। এই গাড়োয়াল দুইভাগে বিভক্ত, ব্রিটিশ ও স্বাধীন। ব্রিটিশ গাড়োয়ালের রাজধানী পৌড়ী—স্বাধীন গাড়োয়ালের রাজধানী টিহরি। ইহাতে অনেক 'গড়' থাকাতে নাকি গাড়োয়াল এই নাম হইয়াছে।

কাণ্ডী ও ঝাপানওয়ালাদিগকে অনেকটা খাসিয়াদের ন্যায় দেখায়।* বিশেষত্ব এই, সকলেরই 'জনুই' অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত আছে, হয় ছত্রি, নয় ব্রাহ্মণ। আমাদের কাণ্ডীবাহক ব্রাহ্মণ ছিল কি জানি ব্রাহ্মণ

* পরিধানে লেংটি, গায়ে ছেঁড়া ও মলিন জামা এবং কম্বল জড়ান, মাথায় টুপি, মধ্যে মধ্যে পায়ে নাগরাই জুতা দেখা যায়।
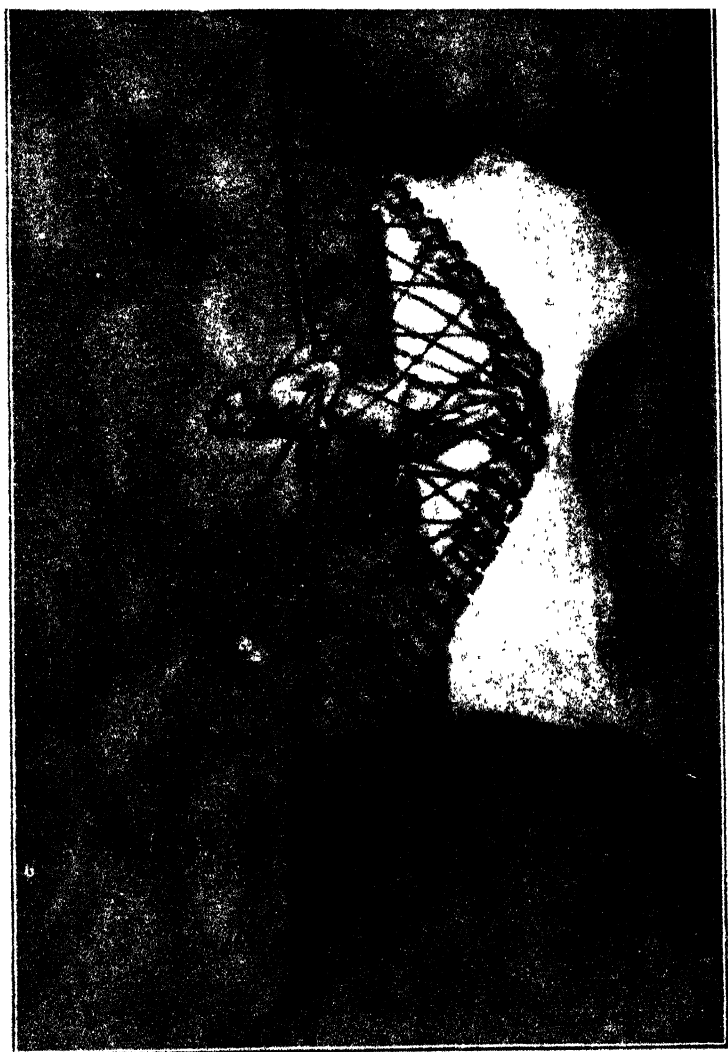
বলিলে আমরা ভারবহনে নিযুক্ত না করি এই জন্য সে নিজকে প্রথমতঃ ছত্রি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। হায় ব্রাহ্মণ! হায় ক্ষত্রিয়!

সেইস্থান হইতে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দিয়া ১॥ মাইল রাস্তা চলিয়া লক্ষ্মণঝোলা আসিয়া পৌছিলাম। পথে লক্ষ্মণদেবের মন্দির দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে একটি মাইলষ্টোন্ পাওয়া গেল। ইহাতে লিখা "বদরিকানাথ হইতে ১৬৪ মাইল, হরিদ্বার হইতে ১৭ মাইল। গঙ্গার সমীপে দোকান-পাট ও ধর্ম্মশালা আছে; কিন্তু ঐ গুলি যাত্রীতে পরিপূর্ণ। গঙ্গার উপরে পূর্ব্বে ঝোলা অর্থাৎ দড়ীর সাঁকো ছিল। তাহাতেই লক্ষণঝোলা নাম হইয়াছিল। ঐ ঝোলার পার হওয়া যাত্রীরা কঠিন কাজ মনে করিত। অনভ্যাসের কাজ কঠিন মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা বদরী পথে অনেক ঝোলা দেখিয়াছি এবং ডাক্তার বাবু একটা পারও হইয়া দেখিয়াছিলেন; যদিও দোলে তথাপি বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়া বোধ হইল না। যাহাই হউক, এখন দড়ীর ঝোলার পরিবর্ত্তে রায় বাহাদুর সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালার ব্যয়ে প্রায় ২৫ বৎসর হইল লোহার ও কাঠের ঝোলা নির্ম্মিত হইয়াছে; অতএব আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। *

* ঝোলার নির্ম্মাণ-কৌশল এইরূপ, নদীর দুই পারে দুইটা সুদৃঢ় খুঁটা পুতিয়া দুইটা দড়ির প্রান্ত ইহাতে বাধা হয়। ঐ দাড়ি দুইটি প্রান্তদ্বয়ে মিশিলেও মধ্যভাগে ফাঁক থাকে; কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের প্রান্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে দড়ি দিয়া বাধিয়া পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ রজ্জুর সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয় যেন কাষ্ঠ খণ্ড গুলি পরস্পর অল্প ব্যবহিত সমান্তরাল ভাবে দড়ি দুইটার দুইহাত নীচে ঝুলিয়া সিঁড়ির ন্যায় দেখাইতে পারে। ঐ গুলি আবার পরস্পর জালের ন্যায় রজ্জুর দ্বারা সংবদ্ধ। পার হইতে হইলে যাত্রীকে দুই বগলে দুই দড়ি ঠেকাইয়া উহা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ড গুলির উপর প দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। ঐ সময় কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতিও দোলে কিন্তু পতনের বিশেষ ভয় নাই।

লক্ষ্মণজীর মন্দির দর্শন পূর্ব্বক ঝোলার নিকটে আসিতে খানিকটা জায়গা সমতল দেখিলাম, ইহারই নাম তপোবন। নামেই স্থানের পরিচয়; কিন্তু হৃষীকেশের ন্যায় এখানে কোনও সাধন কুটীর আমাদের নয়ন গোচর হইল না। শুনিলাম এখানে ভাল ধান জন্মে।

আমরা পুলের নিকটে আসিয়া গৃহগুলি জনাকীর্ণ দেখিয়া নদীর ওপার চলিয়া গেলাম। সেখানে একটা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লাভ করিলাম। এখানে একটা ডাকঘর ও ফাঁড়িথানা আছে।

সারাদিন না খাওয়াতে এখানে রাত্রিতে পাকের বন্দোবস্ত করিতে হইল। ডাক্তার বাবু রন্ধনাদি করিলেন। বাতাস ও বৃষ্টিতে কিছু অসুবিধা হইল। আমরা ৩২ দিন পাহাড়ে ছিলাম; আর কোনও দিবস রাত্রিতে ডাক্তার বাবু অন্নাহার করেন নাই। আমিও নিজকে পথশ্রমে নিতান্ত দুর্ব্বল মনে না করিলে রাত্রিকালে ভাত খাই নাই। প্রায়শঃ সামান্য দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ মিষ্ট এবং কদাচিৎ রুটি খাইয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।

পাহাড়ে আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে আটা, চাউল, ডাইল, লবণ, মরিচাদি সামান্য মসলা, ঘৃত, চিনি, আলু, দুগ্ধ (প্রায়শঃ), কলা (কদাচিৎ), কাঁচকলা (ক্বচিৎ) মিষ্টকুষ্মাণ্ড (মধ্যে মধ্যে) পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় চটিতে পুরি এবং পেড়াও পাওয়া যায়। এই সকল জিনিষের মূল্য যে অধিক হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। আটার সের সচরাচর ।০ চাউল ।/০-।৵০; কিন্তু উপরে উঠিলে, যেখানে চড়াই ও পথের স্বল্প পরিসরতা নিবন্ধন ব্যবসায়ীরা ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে মাল বোঝাই দিয়া লইয়া যায়, আটার সের ।৵০ আনা পর্য্যন্ত এবং চাউলের সের ॥০ আনা (এমন কি দুই এক জায়গায় ॥/০-॥৵০ আনা) পর্য্যন্ত পাইয়াছি। আলুর সের ৵১০-৶, ঘৃত সর্ব্বত্র টাকায় ৸ পোয়া, দুগ্ধ ৶০ হইতে ।০ আনা। ঘৃত ও দুগ্ধ মাহিষা, তাহাও ঠিক বিশুদ্ধ যে পাওয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না।

ডাইলের মূল্য বেশী নয়, আমরা মুগ ভিন্ন অন্য ডাইল খাই নাই ; কিন্তু ইহার বেশ অর্দ্ধেক পরিমাণেরই ত্বক্ দৃঢ় সংলগ্ন থাকিত। অতএব আমরা প্রায়শঃই আলুসিদ্ধ, ঘৃত, একটা কাঁচকলা বা মিষ্ট কুমড়ার তরকারী খাইতাম। পাকের কর্ত্তা ডাক্তারবাবু হরিদ্রা খান না—তবে তিনি বাড়ী হইতে অন্যসমস্ত মসলার গুঁড়া ও পাঁচফোড়ন আনিয়াছিলেন। পথে লাক্ড়ি অবশ্য মহার্ঘ পাই নাই, ৫ পয়সায় আমাদের পাক হইত।

এক এক চটিতে অনেক ঘর আছে, ঘরের মালিক ভাড়া নেয় না, কেননা বদরীযাত্রীর কাছ হইতে উহা গ্রহণ করা পাপ ; কিন্তু তাহার ঘরে থাকিতে হইলে তাহার দোকান হইতে জিনিষ কিনিতে হইবে। এই জন্যও জিনিষের দর অনেকটা বেশী হইয়া পড়ে। তবে প্রত্যেক যাত্রীকে, জল আনিবার জন্য ঘড়া এবং পাকের পাত্র না থাকিলে তাহা, দোকানদার যোগাইয়া থাকে। ইহার জন্য পয়সা নিবে না। পাকের স্থানও উহারাই পরিষ্কার করাইয়া থাকে।

পথে ২।৩ মাইল অন্তরই চটি পাওয়া যায়। ঘরগুলি প্রায়শঃ পর্ণ-কুটীর ; কিন্তু যেখানে শীতের প্রকোপ কিছু বেশী, সেই সকল উচ্চতর ভূমিতে কাঠ পাথরের পাকা মোকামই বেশী এবং দোতালাগৃহও পাওয়া যায়। জল প্রায়শঃ ঝরণার। তবে নিম্নতর ভূমিতে নদীতেও যাওয়া যায়। প্রত্যেক চটিতেই একজন ভাঙ্গি নিযুক্ত আছে। যাত্রীরা ঝাড়ে ঝোড়ে শৌচকর্ম্ম করিয়া থাকে। প্রস্রাব যত্র তত্র করিতেই দেখাযায়। ভাঙ্গির মাত্র দুইটি কার্য্য দেখা যায়। (১) চটির ১ ফার্লং পরিমাণ আগে ও পাছে এক একটী নিশান পুতিয়া রাখা ; এবং (২) কেহ ঐ দুই নিশানের মধ্যে শৌচকর্ম্ম করিলে তাহার কাছ হইতে পরিষ্করণার্থ পয়সা আদায় করা। আমরা এই লাল নিশানের নাম "ডিষ্টেণ্ট সিগ্নেল্" রাখিয়াছিলাম। পাহাড়ের বাঁকের ভিতর কোনও চটি দূর হইতে অদৃশ্য থাকিলে নিশান

দেখিয়া চটির সত্ত্বা অবগত হওয়া যাইত। এই নিশানের সীমার বহির্ভাগে যাত্রীরা পথের কিনারায়, এমন কি, পথের মধ্যে ও অপরিষ্কার করিয়া রাখিত—ভাঙ্গি তাহা পরিষ্কার করা বোধ হয় স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করে না।

সঙ্গী গোমস্তা ব্রাহ্মণ এবং কাণ্ডীওয়ালা দ্বারা রন্ধন কার্য্যের অনেক সহায়তা হইত। চটির ঘর দেখা, চাউল প্রভৃতি কেনা, জল আনা ইত্যাদি কার্য্য গোমস্তা ঠাকুর করিতেন কাণ্ডীওয়ালা পোড়া বাসন ও উচ্ছিষ্ট থালাবাটি মাজিত। এই সকল কার্য্যের জন্য উভয়কেই বিদায় কালে পুরস্কার দিতে হইয়াছিল।

এই পাহাড়ে তামাকু সিগারেট পাওয়া যায়, কিন্তু পান পাওয়া যায় না।

২য় দিবস বুধবার ২৮শে বৈশাখ,

শনৈঃপর্ব্বত লঙ্ঘনম্।

লক্ষ্মণ ঝোলায় পর্য্যটনের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন সেইখানেই ভাগীরথীতে অক্ষয়া তৃতীয়ার স্নানাদি করিয়াছিলাম। পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বেলা ৮ ঘটিকার সময় পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রকৃত পক্ষে সেই দিনই আমাদের হিমালয় ভ্রমণ আরম্ভ হইল। পথ যদিও গরুর কি ঘোড়ার গাড়ী চলিবার উপযুক্ত নয়, তথাপি ইহা শড়কই বটে। চৌড়া গড়ে ৪ হাত, একদিকে পর্ব্বতের গাত্র, অন্যদিকে ভাগীরথী বা তদীয় উপনদী বিশেষের খাত অথবা তাদৃশ কোনও খাত। যাহারা এইরূপ পথে চলিতে অনভ্যস্ত তাহাদের প্রথম প্রথম ভয় হইবার কথা। আমি চেরাপুঞ্জী হইয়া শিলঙ্গে বহুবার পদব্রজে গিয়াছি, ঈদৃশ পথ সুতরাং কোনরূপ ভীতিপ্রদ হয় নাই।

প্রায় ১০ মাইল পথ চলিয়া পৌনে ১২টার সময় আমরা মোহন চটিতে পৌঁছিলাম। পথে ফুল-বাড়ী চটি (লক্ষ্মণ ঝোলা হইতে ৪॥ মাইল) ও গুলর চটি (ফুলবাড়ী হইতে ২॥ মাইল) পাইয়াছিলাম কিন্তু কুত্রাপি অবস্থান করা হয় নাই ; কেন না কাণ্ডীওয়ালা আগেই চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার মোহন চটিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবার কথা ছিল। নচেৎ রৌদ্র বড় খরতর হইয়া উঠিয়াছিল ; তখন ভ্রমণ অত্যন্ত ক্লেশ কর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তা ভালই ছিল। তথাপি পার্ব্বত্য পথ, কিছু না কিছু চড়াই উৎরাই (উঠা নামা) আছেই। চড়াই উঠিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে দেখিয়া গোমস্তা বলিলেন, "বাবজী গরুড় ভগবান্‌কে স্মরণ করুন ভগবান্ বলিযাছেন, যাহারা আমার দর্শনার্থ আসিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হয়, তাহাদিগকে আমি গরুড় দ্বারা আমার নিকট আনয়ন করি।" গোমস্তা ঠাকুরের কথায় আমরা "গরুড় ভগবান্‌কি জয়" ডাকিলাম বটে কিন্তু পক্ষিরাজ আসিলেন না। কথাটা কি বাস্তবিক মিথ্যা ? তাহা নয় ; এই গরুড় শরীরী বিহঙ্গম নহে কিন্তু তথাপি নারায়ণের বাহন ; হৃদয়ের ভক্তি বিশ্বাসই সেই গরুড়, উহাই ভগবানের নিয়ত বসিবার স্থান। যখন পথ ক্লেশে শরীর দুর্ব্বল হয়, তখন মনের ভক্তি বিশ্বাসের বলেই আমাদিগকে তাঁহার দিকে চালনা করিয়া লইয়া যায়। অপিচ ইহা প্রকৃতই বিনতা-নন্দন, বিনতের আনন্দন ; এবং ইহা পবনাতিরেক বেগশালী, কেন না মুহূর্ত্ত মধ্যে মনকে মর্ত্ত্য হইতে বৈকুণ্ঠ লইয়া যায়। এইরূপ ভাবনায় বাস্তবিক পথ যেন অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। চটিতে আসিয়া দেখি, উহা লোকে পরিপূর্ণ,—বস্তুতঃ ; আমরা একান্ত অসময়ে সেই স্থানে পহুছিলাম। যাত্রীরা প্রত্যুষে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া রৌদ্রের তেজ খরতর হইতে না হইতে চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার রৌদ্র যখন একটু পড়িয়া আইসে তখন কিছুটা পথ চলিয়া রাত্রি যাপনের নিমিত্ত চটি বিশেষে আশ্রয়

লাভ করে। আমরাও অন্যান্য দিন তাহাই করিয়াছি। কাণ্ডীওয়ালা বোঝা লইয়া যাত্রীদের সঙ্গে চলিতে পারে না, অনেক সময় পথে বিশ্রাম করিয়া কাটায়; এই জন্যই চলিবার অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা আগে উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। অত্যাবশ্যক দুই একখানি জিনিষ গোমস্তা ঠাকুরই, যিনি কদাপি আমাদের কাছ ছাড়া হন নাই, অম্লানবদনে বহন করিতেন।

মোহন চটিতে আমরা যে একদল যাত্রীর নিকটে জায়গা লইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে একটি পাঁচ মাসের শিশু ও একজন ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ; ইহারা লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছে। বৃদ্ধের এই তৃতীয় বার বদরী যাত্রা— খুব উৎসাহ। ইহাদের দেখিয়া আমাদেরও মনে সাহস আসিল।

চটিটি বেশ সমতল জমিতে অবস্থিত, নিকটে একটা নদী প্রবহমানা, নাম হিরণ্যগঙ্গা (ওরফে হিউল)। ক্রোশ পরিমিত দূরবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতের অধিবাসী ২।৩ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া এই নদীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক ছাপার গ্রন্থ তথা বদরীনাথ ও কেদারনাথের মাহাত্ম্যগ্রন্থপাঠ ও হিন্দী অনুবাদ শুনাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিছু দক্ষিণা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাঠের ব্যাখ্যা করার রীতিতে ব্রাহ্মণ দিগকে মূর্ত্তিমান্ গ্রামোফোন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত বেগে পাঠাদি চলিতেছে বটে, কিন্তু যাহা বলা হইতেছে, তাহার অর্থ পাঠক স্বয়ং বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ! পোনে পাঁচটায় রৌদ্র কিছু পড়িলে আমরা চটি ছাড়িয়া পথ চলিতে লাগিলাম। অশীতিপর বর্ষীয়ানের দল দৈনিক এক বেলা মাত্র পথ চলে, কেন না উহারা বিশেষ সাবধান। কিন্তু এক বেলাতে ১০।১২ মাইল অতিক্রম করিত। যাহা হউক, এখান হইতে একটা বড় চড়াই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইল; তাই মাত্র ৩॥ মাইল চলিয়াই প্রায় ৭টার সময় বিজনী চটিতে রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয়

গ্রহণ করিলাম। দোতালা একটা পাকা ঘরের উপরের তলায় আমাদের জায়গা হইল। ডাক্তারবাবু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিঠাই খাইলেন আমি গোমস্তার সাহায্যে কিছু অন্ন পাক করিয়া খাইলাম।

খুব ভোরে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে কাণ্ডীওয়ালাকে বিদায় দিয়া পশ্চাৎ প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। এইদিন রাস্তায় মন্থরগামী যাত্রী অনেককে পথে অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। দুইদল যাত্রী পরস্পর দেখা হইলে—বিশেষতঃ কাহাকেও ক্লান্তিযুক্ত দেখিলেই— "জয় বদরী বিশাল লালাকি জয়" "জয় কেদারনাথ স্বামীকি জয়" "জয় গরুড় ভগবান্ কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। বাস্তবিক ইহাতে মনে বল ভরসা আসে। আবার যখন দেখিলাম, বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা মাথায় ১০।১৫ সের মোট লইয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে, যখন দেখিলাম, কোনও কোনও যুবতী শিশুটিকে কোলে বাঁধিয়া চলিয়াছে—শিশু কাঁদিলেই পথ প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া স্তন্য পান করাইতেছে—যখন দেখিলাম বাতাদি রোগ পীড়িত ব্যক্তিও বেদনায় অস্ফুটধ্বনি করিতে করিতে আস্তে আস্তে গমন করিতেছে— এমন কি দুই একটা অন্ধও অপরের হাত ধরিয়া চলিতেছে, তখন মনে হইল, "যদি ইহারা বদরীনাথের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে সবল সুস্থকায় আমরা কি তাঁহার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে তদীয় পদপ্রান্তে পৌঁছিতে পারিব না?"

প্রায় সকল যাত্রীরই পায়ে জুতা আছে কিন্তু মাথায় ছাতা অতি কম যাত্রীরই দেখিলাম। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে, 'রবির খরকিরণ সহ্য হয়, সূর্য্যাতপতপ্ত ধূলি নিতান্তই অসহ্য।' কিয়দ্দূর পথ চলিবার পর আমার জুতার সেলাই টুটিয়া গেল, অতএব কিয়ৎক্ষণ আমাকে নগ্নপদে চলিয়া ধূলি কঙ্করাদি-সঙ্কুল আতপতপ্ত পথের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে হইয়াছিল। অনাগতবিধাতা ডাক্তারবাবু এই জন্য ২।১ যোড়া অতিরিক্ত

কেন্‌ভাসের জুতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন—কেনভাসই ভাল, শস্তাও হয়, অথচ নূতনে পায়ে ফোস্কা পড়ে না। যাহা হউক যন্ত্রবিষা হইলেও আমি কিঞ্চিৎ পথক্লেশ অনুভব পূর্ব্বক কিছুটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লাভ করিয়া মুচি না পাওয়া পর্য্যন্ত জুতা চলসই রাখিবার একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছিলাম। সকল চটিতে মুচি পাওয়া যায় না। আবার যে সকল মুচি পাওয়া যায় ইহারা প্রায়শঃ নাগরাই জুতাই সিলাই করিতে জানে। আমরা প্রাতে কুট্টি চটি (৩ মাইল) ও বান্দর চটি (৩মাইল) অতিক্রম করিয়া মহাদেব চটিতে (৩মাইল) ১০টার সময় পৌছিলাম। কোন্ চটিতে থাকিতে হইবে, তাহা আমারা পূর্ব্বেই ঠিক্ করিয়া কাণ্ডী ওয়ালাকে বলিয়া দিতাম। এই বিষয়ে আমাদিগকে গোমস্তা ঠাকুর বা কাণ্ডীওয়ালার উপরমাত্র নির্ভর করিতে হয় নাই। আমরা হরিদ্বার হইতে হিন্দীভাষায় লিখিত "শ্রীবদরীনাথ কেদারনাথকে যাত্রাকা হাল" নামক একখানি পুস্তক * কিনিয়া আনিয়া ছিলাম। ইহা অযোধ্যা প্রদেশের কোনও ব্যক্তি নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তচ্ছলে লিখিয়াছেন, লক্ষ্ণৌর মোন্‌সী নেউল কিশোর প্রেস্ হইতে প্রকাশিত। এইখানি আমাদের প্রধান পরিচালক ছিল। তবে ঐ ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বদরী গিয়াছিলেন। তৎপরে অনেক নূতন চটি হইয়াছে, অনেক চটির স্থান পরিবর্ত্তন—তথা নাম পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। আবার নূতন পথও হইয়াছে।

* এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ হিন্দীভাষায় আরও দেখিয়াছি। গাড়োয়াল জেলার নন্দ প্রয়াগ নিবাসী পণ্ডিত মহেশানন্দ শর্ম্মা প্রকাশিত "কৈলাশ যাত্রা বা বদরিকাধাম পথপ্রদর্শিকা" এবং সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ নিবাসী ঢোলনমল শেঠ প্রকাশিত "উত্তরাখণ্ড যাত্রা" এখানে উল্লেখ যোগ্য। তবে চটি ও পথের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পশ্চাৎ ঘটিয়াছে। নন্দপ্রয়াগে মহেশানন্দ শর্ম্মার নিকট পথের পরিচয়ের মানচিত্রও পাওয়া যায়।

যেমন ফিরিবার সময় কাঠগোদামের পরিবর্ত্তে এখন যাত্রীরা রামনগর আসিয়া রেলধরে।

মহাদেব চটিতে মহাদেবের এক মন্দির আছে। তাহারই নিকটে পোষ্ট আফিসও আছে। সন্নিকটে ভাগীরথী প্রবাহিতা; বেশ আরামে স্নান করিলাম। তৈল মধ্যে মধ্যে কিনিতে পাওয়া যায়, এবং তীর্থ যাত্রীর তেল মাখা নিষেধ হইলেও "অতৈলং সার্ষপং তৈলং" সপ্তাহে ১।২ দিন ব্যবহার করিয়া শরীরটাকে স্নিগ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মহাদেব চটিতে মুচি ছিল—চর্ম্ম সূত্র দ্বারা জুতা সেলাই করাতে আমার জুতাটিই মাটি হইল। অপরাহ্ন পাঁচটার সময় চটি হইতে রওয়ানা হইয়া ৭টার সময় দাদর চটিতে (৪ মাইল) পৌঁছিয়া রাত্রির জন্য জায়গা লইলাম। এই চটি বড় ছোট, জিনিষপত্রও ভাল মিলে না।

৪র্থ দিন শুক্রবার ৩০শে বৈশাখ

ব্যাসচটি।

ভোরে দাদর চটি ছাড়িয়া ২ মাইল গিয়া একটি সুন্দর চটি দেখিলাম, নাম কাণ্ডি চটি। এখানে গোপালজীর মন্দির এবং একটি হাসপাতাল আছে। তৎপরে প্রায় ৮টার সময় একটা লোহার পুল পার হইলাম। এইস্থানে দুইটি পথ পাওয়া যায়; এক রাস্তা কাঠদোয়ার রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে, অন্য রাস্তা বদরীনাথের। এখান হইতে বদরী ১৩৩ মাইল। আধ মাইল আগে ব্যাস চটি। কিন্তু মধ্যে একটি শিব মন্দিরের নিকট ব্যাস-গঙ্গা (যাহার উপর দিয়া পুল পার হইয়াছি) ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। এইস্থানকে ব্যাসপ্রয়াগ বলে। আমরা এখানে স্নান তর্পণ করিয়া ব্যাস

চটিতে গিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিলাম। এই স্থানে একটি পোষ্ট আফিস্ আছে। ৫টার সময় যখন চটি ছাড়িয়া আসি, তখন একটি মন্দির হইতে এক ব্রাহ্মণ ডাকিয়া বলিলেন, 'এই ব্যাসজীর মন্দির দর্শন করিয়া যান।' গোমস্তা ঠাকুর—উহা প্রকৃত ব্যাসের মন্দির নয়, এই কথা বলাতে দুই জনের মধ্যে খুব এক পসলা গালি বর্ষণ হইয়া গেল! এই স্থান হইতে পাকদণ্ডীতে (কাঁড়ি পথে) অল্পদূর গিয়াই প্রকৃত ব্যাস মন্দির পাইলাম। স্থানটি অতি মনোরম; মন্দিরটিও প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইল। মন্দিরে ব্যাসের পুত্র হইতে প্রপিতামহ পর্যান্ত পাঁচ পুরুষেরই বিগ্রহ আছে। এখান হইতে শড়কে চলিয়া ঝালর চটি (১ মাইল) অতিক্রম করিয়া উমরাসু চটিতে (২ মাইল) রাত্রি যাপনার্থ অবস্থিত হইলাম।

৫ম দিন শনিবার ৩১শে বৈশাখ ১৩১৭

দেবপ্রয়াগ।

এই দিন বৈশাখের শেষ দিন; দেবপ্রয়াগে স্নানাদি করিতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিলাম। এখন পর্ব্বতের উচ্চাবচ পথ চলা অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে—সমান্য চড়াই উঠিতে আর তেমন গায়ে লাগে না। পথ ভালই ছিল। কিঞ্চিদধিক দেড় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল পথ চলিয়া দেবপ্রয়াগে ৮টার সময় পৌঁছিলাম। পথে অমরকোটে একটী ছোট চটি ছিল—স্থানটীতে অনেক ফলের গাছ দেখিলাম। এই স্থানটি দেব-

প্রয়াগ নিবাসী পাণ্ডাদের অধিকৃত এবং এথান হইতেই যাত্রী ধরার জন্য পাণ্ডাগণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। দেব প্রয়াগের পাণ্ডাগণই বদরীর পাণ্ডা। আমাদের পাণ্ডা (উমাশঙ্কর-শালিগ্রাম-চন্দ্রপ্রসাদ) পূর্ব্ব হইতেই ঠিক ছিলেন কেননা তাঁহাদেরই ভাগশঃ গোমস্তা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। "দেব-প্রয়াগ" অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থান—এই অলকানন্দারই তীরে বদরীনাথ পুরী। দেবপ্রয়াগ একটি সমৃদ্ধ স্থান—অলকানন্দার উভয় তীরে অবস্থিত। এক পার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত, অপর পার তিহরি রাজ্যের অধীন। ব্রিটিশ পারে একটি পোষ্ট আফিস আছে কিন্তু যেখানে দুই নদীর সঙ্গম এবং দোকান পাট ও দেব মন্দিরাদি বর্ত্তমান উহা তিহরি রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট। একটি পুল পার হইয়া আমরা আমাদের পাণ্ডার নিকেতনে উপনীত হইলাম। যে ঘরে আমাদের বাসা হইল উহাতে অনেক সাহেব বিবির ছবি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অপর নানাবিধ উপকরণ দেখিলাম। দেবমূর্ত্তির মধ্যে কেবল সপার্ষদ বদরীনাথের এক খানি রঞ্জিত (এবং অতিরঞ্জিত) ছবি দেখিলাম।

চিত্রপট দেখিয়াই বুঝিলাম উহা কল্পিত—তবে বদরীনাথের অবয়ব সংস্থান এইরূপই হইবে, ইহা ধারণা হইল। উপরের হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম নীচের হস্তদ্বয় ধ্যানাবস্থার সূচক। মূর্ত্তিতে চক্র ও গদার অভাব দেখিয়া উৎপ্রেক্ষা করিলাম যে অস্ত্র আইনের ভয়েই বুঝি নারায়ণও শঙ্খপদ্মমাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তা বেশ—কিন্তু দুঃখের বিষয় পদ্মটির স্থলে চক্র হওয়াই নাকি ঠিক ছিল—কেন, সে কথা পরে বলিব।

উত্তরাখণ্ডের পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগই প্রথম পাওয়া যায়—তাই এথানে 'মুণ্ডন' অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ—এই পঞ্চ প্রয়াগ। প্রয়াগের ঘাটে পিণ্ডদান তর্পণ এবং সতৈজস অন্নজলবস্ত্রাদি দান হয়। বাগে পাইলে পাণ্ডাজীরা

গোদানও করাইয়া থকেন। একটু গোবর হাতে দিয়া প্রয়াগ ঘাটের উপর সংস্কৃত মন্ত্র পড়াইয়া যজমানের অতর্কিতে গোদানের সংকল্প করাইয়া ফেলেন, তারপর তন্মূল্য আদায় করেন। আমাদের হাতে গোবর দিবামাত্রই ব্যাপার বুঝিয়া উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেই ; ১৷০, ১৷৷০ মূল্যের গো-দান করিয়া জানিয়া শুনিয়া পুণ্যের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু উপার্জ্জন করিতে উৎসুক হই নাই।

ঘাটের উপরেই অনেকটা সিঁড়ি বাহিয়া রামচন্দ্রজীর মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দির খুব উচ্চ ও বহুদিনের প্রাচীন বোধ হইল। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি আছে। নিকটে অন্যান্য দেবতারও মন্দির আছে।

দেবপ্রয়াগে আমাদের নাম ধামাদি পাণ্ডার খাতায় লিখিত হইল—বদরীনাথের কাজ এখানেই সারিয়া ফেলা হইল ; অথচ বদরী এখান হইতে বরাবর গেলেও ১২৩ মাইল।

৬ষ্ঠ দিন রবিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ

বিল্বকেদার।

আমরা সেইদিন দেবপ্রয়াগেই রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন বদরীর পথ ধরিলাম। কেহ কেহ এখান হইতে তিহরি রাজধানীর অভিমুখে গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী দর্শনার্থ রওনা হইল—উহারা সমগ্র কেদারখণ্ড প্রদক্ষিণ করিবে। আমরা এখন অলকানন্দার কিনারা দিয়া যাইতে লাগিলাম। পাচ মাইল গিয়া রাণীবাগ নামক চটিতে অলকানন্দায় স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ

জলযোগ করিলাম, তৎপর আর মাইল চলিয়া রামপুর চটিতে মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিলাম। পরে প্রায় ৫ টার সময় বাহির হইয়া বিল্বকেদার নামক স্থানে (৭ মাইল) ৭ টার সময় পৌছিলাম। চটির সমস্ত ঘরগুলি যাত্রিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কষ্টে স্বষ্টে একটি জানালাহীন অন্ধকার ছোট পাকা কুঠরী রাত্রিযাপনের নিমিত্ত পাওয়া গেল। সায়ংকৃত্য করিয়া বিল্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। কেহ কেহ এই স্থানটিকে ভিল্ল-কেদার বলে, কেন না, মহাদেব ভিল্ল অর্থাৎ কিরাতরূপ ধারণ পূর্ব্বক এইখানে নাকি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তপস্যার ফলস্বরূপ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

এই রাত্রিতে প্রায় ৩টার সময় উঠিয়া আমরা হেলির ধূমকেতু দেখিয়াছিলাম—কি ভয়ানক লেজ—আকাশের পরিধির প্রায় এক চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া দ্বিতীয় ছায়া পথের ন্যায় দেখা গিয়াছিল। পাহাড়ে দৃষ্টিরোধ হওয়ায় উহার অধোভাগস্থ তারকা আমরা দেখিতে পারি নাই। পূর্ব্বে ক্ষুদ্রতর অবস্থায় হরিদ্বারে সর্ব্বপ্রথম উহার দর্শন পাই, তখন সম্পূর্ণটাই দেখিয়াছিলাম পশ্চাৎ কিছুদিন পরে পশ্চিমগগনে ২।৩ দিন সন্ধ্যার সময় ইহার সংক্ষিপ্ত আকার দেখিয়াছিলাম। এই দিন হইতেই মাইল-ষ্টোন্ বিরল দর্শন হইয়া পড়ে।
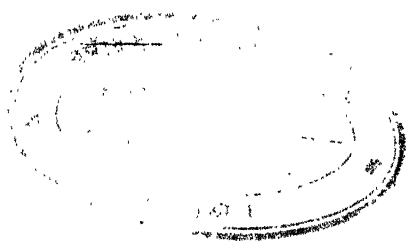
৭ম দিন সোমবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ

শ্রীনগর।

প্রাতঃকালে বিল্বকেদার ছাড়িয়া তিন মাইল আসিয়া কমলেশ্বরের মন্দির পাইলাম। সেই স্থানে মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দর্শনান্তর আরও মাইল খানিক চলিয়া বেলা ৮টায় শ্রীনগর সহরে পৌছিলাম। শ্রীনগর একদিন খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল—সম্প্রতি নানা কারণে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্থানটিতে অনেকটা জমি সমতল। ইহা পূর্ব্বে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই অংশ কালক্রমে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও ইহাই প্রধান নগর ছিল। এক্ষণে ব্রিটিশ হেড্‌কোয়াটার এই স্থান হইতে ৮মাইল দূরবর্ত্তী পৌড়ীতে হইয়াছে। শ্রীনগরে অনেকানেক পাকা মন্দির ছিল। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূকম্প যেমন এই আসাম অঞ্চলের অনেক জায়গায় সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সেইরূপ ১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসের এক দৈবী ঘটনা গাড়োয়ালের অনেক স্থানের, বিশেষতঃ শ্রীনগরের, ধ্বংস সাধন করিয়াছে। শ্রীনগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল উপরে বিরহি-গঙ্গা নামে অলকানন্দার একটি উপনদীর সঙ্গম-স্থান। ঐ সঙ্গমের ৫।৬ মাইল উজানে একটা পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ায় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে নদীর জলস্রোতঃ অবরুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটা নালা কাটিয়া জলস্রোতঃ ক্রমশঃ নিঃসারিত করা যায় কিনা, তজ্জন্য বহুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন—কেন না অবরোধ স্থানে প্রচণ্ড জলরাশি স্ফীত হইয়া জমিয়াছিল, উহার চাপে সহসা পর্ব্বত গাত্র ভেদ হইলে বিরহি গঙ্গা ও ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানের লোকদের বিষম ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই নিমিত্ত নোটিস দিয়া অধিবাসীদিগকে নদীর তীর হইতে

অন্ততঃ ২০০ ফিট সরিয়া বাস করিতে আদেশ দেন। এবং পাহাড় ভেদ হইলে তারযোগে নানাস্থানে সংবাদ দিবার জন্য ঐ স্থান পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন করা হইয়াছিল। পাহাড়টা নিরেট পাষাণময় হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের নালা কাটিবার চেষ্টা বিফল হয়।

১৮৯৪ সালের ২৫শে অগষ্ট রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা প্রবল বেগে জলরাশি নির্গত হইয়া দুকূল ভাসাইয়া চলিল—গবর্ণমেণ্টের কৃত সাবধানতায় লোকের জীবন ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা হইল বটে, কিন্তু পাকা কাঁচা দোকান তাবৎ মুহূর্ত্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া গেল— শ্রীনগর একেবারে শ্মশানে পরিণত হইল। কেবল কমলেশ্বরের মন্দির এই বিপ্লবের মধ্যেও টিকিয়া রহিল।

শ্রীনগরে ডাক্তারখানা, টেলিগ্রাফ আফিস, থানা প্রভৃতি আছে। বাজারটি নূতন গঠিত হইলেও বেশ বড়, সমস্ত জিনিষই পাওয়া যায়। আমরা এখানে কিছু সওদা করিয়া এবং স্নান ও জলযোগ করিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। ৫মাইল গিয়া শুকদেব চটিতে মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিলাম। ঐ চটি বড় ছোট, একটি মাত্র দোকান। অপরাহ্ণে এখান হইতে ভট্টি চটি (৫ মাইল) গিয়া সায়ংকালে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাত্রিতে দোকানদারের কুকুরটা অনবরত চীৎকার করিতেছিল। শুনিলাম নিকটে নাকি বাঘ আসিয়াছিল। পথে কোনও বন্য জন্তুর ভয়ের কথা এই প্রথম এবং এই শেষ শুনা গেল।

৮ম দিন মঙ্গলবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ

রুদ্রপ্রয়াগ।

এই পর্য্যন্ত গত দুই দিনের পথ বেশ ছিল। এই দিন অনেক চড়াই উৎরাই পাইতে লাগিলাম। থাকর চটি (৩ মাইল) নরকুটা চটি (৩ মাইল) গোলাব রায় চটি (২॥ মাইল) অতিক্রম করিয়া আন্দাজ ১০টার সময় রুদ্র-প্রয়াগ পৌছিলাম। এস্থানে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গম স্থলেও রুদ্রনাথ মহাদেবের মন্দির। যাইতে হইলে বদরীনাথের পথ পরিত্যাগ করিয়া লৌহ সেতুতে অলকানন্দা পার হইয়া কেদারের পথে পড়িতে হয়। সঙ্গম স্থানের নিকটেই যাত্রিগণের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা ও চটি আছে। আমরা রুদ্র প্রয়াগে স্নান তর্পণ করিয়া মহাদেব দর্শন পূর্ব্বক ভোজনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিলাম এবং বদরীর প্রশস্ততর শড়ক পরিত্যাগ করিয়া কেদারনাথের অপেক্ষাকৃত কঠিনতর পথে অপরাহ্ণ হইতে চলিতে লাগিলাম। এখান হইতে কেদারনাথ ৪৫ মাইল, বদরীনাথ ৮৬ মাইল, এবং হরিদ্বার ৯৪ মাইল।

কেদারের পথ কিঞ্চিৎ অপ্রশস্ত হওয়ায় এই পথে ভেড়া ও ছাগলের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ঘোড়া বা গাধা মালবহনে নিযুক্ত হয় না। এক একটী বক্‌রী ১০।১৫ সের এমন কি ॥০ মণ পর্য্যন্ত জিনিস নিতে পারে। এই পথ মন্দাকিনীর কল-কল ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। তাই মনে হইত নামটি 'মন্দাকিনী' না হইয়া "কল্লোলিনী" হইলে শোভন হইত। এই মন্দাকিনীর তীরেই কেদারনাথের পুরী অবস্থিত। আমরা প্রায় ৫॥ মাইল চলিয়া চতোলী-চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম। এই পথ টুকুতে চড়াই উৎরাই বড় ছিল না।

হরিদ্বারে পাণ্ডারা বলিয়াছিলেন যে এইবার বহুতর বাঙ্গালী যাত্রী বদরীনারায়ণ দর্শনে গিয়াছে। এই দিন হইতেই তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে লাগিলাম। বাঙ্গালী যাত্রীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও বিধবা। উহারা বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত চলিয়াছে—অকুতোভয়ে চটি ওয়ালা কাণ্ডী ওয়ালা প্রভৃতির সঙ্গে আবশ্যক কারবার করিতেছে। উহারা যে চটির যে অংশ অধিকার করে, তাহা উহাদের অবিরত গল্পকোলাহলে মুখরিত থাকিত। আমরা চেষ্টা করিয়া উহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতাম—কেন না, রাত্রিতে উহাদের গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমাদের সঙ্গের গোমস্তা ঠাকুর এক দিন বলিয়াছিলেন "বাবুজী বহু যাত্রীর সঙ্গে চলিয়াছি ; কিন্তু আপনাদের বাঙ্গালী স্ত্রী লোকেরা যেমন কোলাহল করে, তেমন আর কেহ করে না।" আমি অবশ্য হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকগুলিও যে বক্‌বক্ করে, তাহা বলিয়া আমাদের দেশের নারীগণের নিন্দাবাদটা সম্পূর্ণ গছিয়া নিতে অস্বীকৃতি দেখাইলাম। কিন্তু আমার বোধ হয় গোমস্তাজী অন্যায় বলেন নাই। আমরা বাবদূকের জাতি। উহাতে আমাদের মধ্যে দিগ্বিজয়ী বক্তা বহুল পরিমাণে জন্মিয়াছেন বলিয়া গৌরব করিতে পারি বটে ; কিন্তু আমার বোধ হয়, বাক্-পটুতা বাঙ্গালীকে কর্ম্মে অপটু করিয়াছে।

৯ম দিন বুধবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ

অগস্ত্যমুনি ও চন্দ্রাপুরী।

চতোলী চটি হইতে প্রাতঃকালে রোওয়ানা হইয়া ৬ মাইল পথ চলিয়া ৮টার সময় অগস্ত্যমুনি ক্ষেত্রে পৌঁছিলাম। পথে বন্ধুরতা খুবই কম। অগস্ত্যমুনির স্থানে অনেকটা জায়গা এত সমতল যে, উহা ক্রীকেট বা পলো

খেলাইবার একটা জায়গা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই স্থানে অগস্ত্যমুনির আশ্রম ছিল বলিয়া প্রবাদ। ইহাতে বেশ সুন্দর দোকান ও অবস্থানের জায়গা ছিল। কিন্তু আমরা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব, মনে করিয়া তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ সারিয়া চলিয়া গেলাম। এখানে এক মন্দিরের মধ্যে মুনিবরের বিশাল মূর্ত্তি স্থাপিত—আবার অস্ত্র-শস্ত্রও আছে। এখানে এ তপস্বীকে কি জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে হইল, বুঝিলাম না। এই আশ্রম বোধ হয় অগস্ত্যের প্রথমাবস্থায় বা সাধন সময়ের—নচেৎ তাঁহার আশ্রম বিন্ধ্যাগিরির দক্ষিণবর্ত্তী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এখানে একটি পোষ্ট আফিস আছে।

অগস্ত্যমুনি হইতে সোরী চটি ২ মাইল; তৎপরে চন্দ্রাপুরীচটি ২ মাইল; এইখানে মধ্যাহ্নকৃত্য করা গেল। এই চটিতে আসিবার পূর্ব্বে সামান্য একটা ঝরণার ন্যায় নদী দুই খণ্ড কাষ্ঠের উপর দিয়া পার হইয়াছিলাম। এই বাবদ খেয়ার পয়সা দিতে হইয়াছিল। এই পর্ব্বতে আর কুত্রাপি খেয়ার পয়সা দেই নাই। পয়সার জন্য পাট্টাদার ভারি পীড়াপীড়ি করে দেখিলাম। এবং লোকের কাছ হইতে অন্যায়রূপে বেশী পয়সা আদায় করা হইতেছে, বলিয়া বিবেচনা হইল। তাই পাট্টাদারের সঙ্গে বেশ একটু তর্ক-বিতর্কও হইল। গবর্ণমেণ্ট এখানে অনায়াসে পুল করিয়া দিতে পারেন। আশা করা যায়, সত্বরই এই অতর্কিত অসুবিধা টুকু দূর হইবেক।

চন্দ্রাপুরী চটিতে ২।১টি দেবমন্দিরও আছে। আমরা এই চটি ছাড়িয়া সায়াহ্নে বিরি চটিতে (৪ মাইল) গিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলাম। এই স্থানে অলকানন্দার উপরে একটী লোহার সেতু আছে। দুপারেই দোকান আছে। দোকানে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়।

১০ দিন বৃহস্পতিবার

গুপ্তকাশী ও শোণিতপুর।

বিরি চটি হইতে আমরা ভোরে রওয়ানা হইয়া কুণ্ড চটি (৩ মাইল) অনায়াসেই পৌছিলাম; পরন্তু কুণ্ড চটি হইতে ৩ তিন মাইলের এক প্রকাণ্ড চড়াইয়ে উঠিয়া অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া গুপ্তকাশী পৌঁছিলাম। কুণ্ড চটি হইতে অপর দিকে আর একটি খাড়া চড়াই উঠিলে যে জনপদ পাওয়া যায় ইহার নাম শোণিতপুর। শোণিতপুর গুপ্তকাশী হইতে ৩ মাইল আন্দাজ পশ্চিমে। গুপ্তকাশীর ঠিক দক্ষিণে মন্দাকিনীর অপর পার্শ্বে পর্ব্বতের উপর উষীমঠ (ওরফে ওখীমঠ)। একটি পাখী গুপ্তকাশী হইতে উড়িয়া উষীমঠ গেলে বোধ হয় উহাকে পোয়া মাইল মাত্র পথ অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু শড়কের পথে মানুষের যাইতে হইলে চারি মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। শোণিতপুর জনপদের মধ্যে বামসু নামক একটি গ্রাম আছে— প্রবাদ এই যে বাণাসুর এখানে বাস করিতেন এই জন্য স্থানের এই নাম। উষীমঠের নামকরণ তত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায় যে বাণকন্যা ঊষা এখানে দেবতারাধনা করিতেন—এই মঠের একতম মন্দিরে ঊষা, অনিরুদ্ধ, চিত্ররেখা, কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। শোণিতপুর হরিবংশাদিতে প্রসিদ্ধ বাণ রাজায় রাজধানীর নাম। হিমালয়স্থ এই শোণিতপুরে নাকি বাণ ও অনিরুদ্ধের মন্দির আছে। আমরা ত আসামের তেজপুরকেই শোণিতপুর বলিয়া সাহিত্য-জগতে ঘোষণা করিয়াছি, * কিন্তু এ যে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল! বাণ শিবভক্ত ছিলেন—শোণিতপুরে নাকি

---

* গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী-সভায় পঠিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে লিখিত "বাণ ও শোণিতপুর" (নব্যভারত বৈশাখ ১৩১৬) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের একটি মন্দির আছে। বাণের প্রার্থনায় তাঁহার অধিকারে কাশী স্থাপিত হয় এবং এই শোণিতপুরের নিকটে একটি "গুপ্তকাশী" সশরীরে বিদ্যমান। হায়, তবে কি আজ আমাদের আসামকে সাধের শোণিতপুরটি হিমালয়কে ছাড়িয়া দিতে হইবে? হিমালয়ের দাবী খুব প্রবল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দাবীর মাতব্বর সাক্ষী আছে সেই সাক্ষী নন্দি সংহিতার কয়েকখানি ছিন্নপত্র—যাহা মল্লিখিত আসাম ভ্রমণ ১ম প্রবন্ধে + আলোচিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকায় যে বাণের বসতি স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। শোণিতপুরে কেদারের পাণ্ডাগণের বাড়ী—অনেকে গুপ্তকাশীতে আসিয়া যাত্রী ধরেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত রুদ্রপ্রসাদ পাণ্ডা কর্ত্তৃক অধিকৃত ও গোমস্তার হস্তে ন্যস্ত ছিলাম, অতএব আমাদিগকে লইয়া কোনও পাণ্ডাকে ব্যস্তসমস্ত হইতে অথবা একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিতে হইল না। বলা আবশ্যক যে গুপ্তকাশীতে কেদারনাথের পাণ্ডাদের অধিকার--যেমন দেবপ্রয়াগে বদরীনাথের পাণ্ডাগণের।

এখানে কাশীর সমস্তই আছেন—বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা গঙ্গা—মায় মণিকর্ণিকা। একটি প্রস্রবণের দুইটি মুখ গজাকার মুখে যে ধারা পড়িতেছে উহার নাম যমুনা। বৃষভাকার মুখে যে ধারা পড়িতেছে উহার নাম গঙ্গা। গঙ্গা ও যমুনার ধারা যে কুণ্ডে পড়িতেছে উহার নাম মণিকর্ণিকা। কুণ্ডের নিকটেই একটি বৃহৎ মন্দির তদভ্যন্তরে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য কতিপয় দেবতার মূর্ত্তি। তন্নিকটে পার্ব্বতীর মন্দির এবং পঞ্চ পাণ্ডবের মন্দির অবস্থিত। গুপ্ত কাশীতে গুপ্তদান করিতে হয়। নারিকেলের গোলার ভিতর সোণারূপা পূরিয়া উৎসর্গ

+ এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৭ সালের ১ম সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হইয়াছিল।

করিয়া পাণ্ডাকে দিতে হয়। কিন্তু গোমস্তাই প্রায়শঃ ইহা আত্মসাৎ করেন।

গুপ্ত কাশী একটি ক্ষুদ্র সহরের ন্যায় স্থান। এখানে একটা পোষ্ট আফিস্ আছে। ইহার উপর কেদারের পথে আর পোষ্ট আফিস্ নাই তাই কেদারনাথ নিবাসী কাহারও নামের চিঠিপত্র এই স্থান হইতেই পিয়ন প্রায় ৩০ মাইল গিয়া বিলি করিয়া থাকে। গুপ্তকাশী হইতে বারাণসীতে একখানি চিঠি দিয়াছিলাম। উহা ১০ই জ্যৈষ্ঠ (অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনে) তথায় পৌঁছিয়াছিল। এখানে নন্দপ্রয়াগের শ্রীযুত মহেশানন্দ শর্ম্মা প্রকাশিত কেদার-বদরী বিষয়ক নানা গ্রন্থ, চিত্র ও মান চিত্র বিক্রয়ার্থ একটি দোকান আছে—আমরা কিছু চিত্র এবং একখানি মাহাত্ম্য গ্রন্থ কিনিয়া নিলাম।

এই দিন একাদশী ছিল—অথচ গুপ্ত কাশীতে এক রাত্রি অবস্থান করিবার কথাও ছিল। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুইটি কারণে এই স্থান ছাড়িতে হইল—এক মাছির প্রবল উপদ্রব—অপর যাত্রীর ভয়ানক ভিড়। এ স্থানে রৌদ্রের তেজ তেমন খরতর বোধ হইল না—তাই তিনটা বাজিতে না বাজিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

গুপ্তকাশী হইতে ১ মাইল ব্যবধানে নালা চটি। এস্থান হইতে এক রাস্তা ঊখীমঠ গিয়াছে, আর এক রাস্তা কেদারনাথ অভিমুখে চলিয়াছে। আমরা কেদারের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম—কেদারের ফেরত যাত্রিগণের অর্থাৎ কেদারনাথ দর্শন করিয়া যাহারা বদরী অভিমুখে যাইতেছে তাহাদের সঙ্গে এখন হইতে দেখা হইতে লাগিল। পরস্পর কাছে আসিলেই "জয় বদরী বিশাললালকি জয়" "জয় কেদারনাথ স্বামীকি জয়" বলিয়া অভ্যার্থনা করিতে হইত।

নালা চটি হইতে নারায়ণ চটি দুই মাইল—এখানেও ২।১টি দেবমন্দির দেখিলাম। নারায়ণ চটি হইতে আরও দুই মাইল উৎরাই নামিয় বেবেঙ্গ

চটিতে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই চটির কাছ দিয়া একটি ঝরণা প্রবাহিত ঐ ঝরণার মধ্যে 'চক্র' বসাইয়া ঘুর্ণিত অস্ত্রের সাহায্যে পাহাড়ীরা বেশ সুন্দর সুন্দর কাঠের বাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, মূল্য ও বেশী নয়। এইরূপ আরও অনেক স্থানে দেখিয়াছি এবং কোনও কোনও স্থলে এইরূপ 'মিলে' ময়দা পিষাও হইয়া থাকে।

একাদশ দিন শুক্রবার ৬ই জ্যৈষ্ঠ—

মহিষমর্দ্দিনী।

উপবাসে ও পথশ্রমে এবং কিছুটা শীত অনুভব হওয়াতে শয্যাত্যাগে একটু বিলম্ব হইল। যাহা হউক, তথাপি ছয়টার পূর্ব্বেই চটি হইতে নির্গত হইলাম। পথ অনেকটা চড়াই ছিল। তিন মাইল গিয়া মহিষ-মর্দ্দিনীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণের একদেশে একটা দোলানা ছিল, যাত্রীরা ইহার উপর উঠিয়া 'দোল' খায় এবং পয়সা দেয়। আমরাও মহিষমর্দ্দিনীকে প্রণাম করিয়া এক একবার দোলায় চড়িলাম। তৎপর এক মাইল গিয়া ৮টার সময় এক চটি পাই লাম; নাম ফাটা চটি। নাম যাহাই হউক না কেন চটিটী ভালই—অনেক জিনিসও মিলে। তখন বেলা ৮টা মাত্র হইলেও মাধ্যাহ্নিক আহারার্থ এখানেই অবস্থান করিলাম। এখান হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ ১৩ মাইল। ইচ্ছা ছিল ঐ দিনই সেই স্থানে চলিয়া যাই; তাই ২টার রওয়ানা হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যখন ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রামপুর চটিতে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা ৪॥টা হইলেও ক্লান্তি বোধহেতু ঐস্থানেই রাত্রি যাপনার্থ থাকিয়া গেলাম। পথে ফাটা হইতে এক মাইল পর ধরাসু নামক এক ছোট চটি এবং আর এক মাইল অন্তর

অপর একটি চটি দেখিয়াছিলাম। রামপুর চটিটী বেশ অনেকগুলি দোকান। কিন্তু উভয় দিক্ হইতে যাত্রী আসাতে গৃহগুলি বেশ জনপূর্ণ হইয়াছিল।

এক দল বাঙ্গালী যাত্রী আমাদের এক ঘরেই আশ্রয় লাভ করিল। একটী অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় ইহাদের সঙ্গে মিলিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ইহার বৃদ্ধা জননী কেদার হইতেই জ্বর নিয়া নামিয়াছিলেন, তিনি চটির দুই মাইল দূরে নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করিয়াছেন। আমরা পথি-মধ্যে রোগী দুই একটী দেখিয়াছি, কিন্তু মরণের সংবাদ আর পাই নাই।

দ্বাদশদিন ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার

ত্রিযুগীনারায়ণ।

রামপুর চটি হইতে দুই মাইল পথ চলিয়া একটা কাঠের পুল পাওয়া যায়। সেই স্থান হইতে দুইটী রাস্তা গিয়াছে—এক কেদারনাথের পথ, অপর ত্রিযুগী নারায়ণের পথ। ত্রিযুগী নারায়ণ এই স্থান হইতে ৩ মাইল ; কিন্তু অনেকটা চড়াই। খুব উচ্চ একটা চড়াই উঠিয়া অৰ্দ্ধ পথে একটী দেবমন্দির পাওয়া যায় এবং এখানে অনেক 'ন্যাকড়া' বাঁধা দেখা যায়। এ স্থানের দেবতার নাম শাকম্ভরী—যাত্রীরা প্রণামী চড়াইয়া পরিহিত বস্ত্রের এক টুক্‌রা ছিঁড়িয়া উপহার দিয়া যায়। শাকম্ভরী—দুর্গার রূপান্তর, ইঁহার উল্লেখ চণ্ডীতেও আছে। ত্রিযুগী নারায়ণের পুরীতে বৃক্ষাদির অভাব হইলেও পথে অনেক বৃক্ষলতা দেখিতে পাইলাম। বেলা ৮॥টার সময় ত্রিযুগী নারায়ণে পৌঁছিলাম।

ত্রিযুগী নারায়ণে অনেক ঘর পাণ্ডা বাস করেন। ইঁহাদের সঙ্গে কেদারনাথের বা বদরী নারায়ণের কোনও সম্পর্ক নাই। তবে কেদারের মোহান্ত বা রাওল সাহেবকে ইঁহারা সকলেই মান্য করিয়া থাকেন।

এই স্থানে না কি, হরপার্ব্বতীর বিবাহ হইয়াছিল উদ্বাহ ক্রিয়াকালে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে একটী কুণ্ডমধ্যে তাহা আজিও ইন্ধন দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেছে। মন্দিরস্থ নারায়ণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগ ইঁহার সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছেন—তাই নাম ত্রিযুগী নারায়ণ। নারায়ণের মূর্ত্তি ধাতুনির্ম্মিত, দক্ষিণে লক্ষ্মী মূর্ত্তি। মন্দিরের বাহিরে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতী কুণ্ড আছে। ব্রহ্মা ও রুদ্র কুণ্ডে স্নান, বিষ্ণুকুণ্ডে মার্জ্জন এবং সরস্বতী কুণ্ডে তর্পণ করিতে হয়। সরস্বতী কুণ্ডের উপরে একটী শিলা আছে। ইহাতে গোদান করিবার জন্য পাণ্ডারা উপদেশ দিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক দেবতা আছেন। মন্দিরের মধ্যে হোমকুণ্ডে হবনার্থ কিঞ্চিৎ দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ললাটে ভস্মরেখা গ্রহণ করিতে হয় এবং জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠের মূল্য দিতে হয়।

ডাক্তার বাবুর এক বন্ধু এখানে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডা তোতারাম রূপরামকেই আমরা বৃত করিলাম। লোকটী ভাল, বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়াই যদৃচ্ছালব্ধ দক্ষিণায় সুফল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই ধামে এক রাত্রি বাস করা উচিত, বিবেচনা করিয়া এদিন আর পথ চলিলাম না। গঙ্গোত্তরী হইতে যাত্রীরা কিরূপ পথে এখানে আইসে, দেখিবার জন্য সেই দিকে বেড়াইতে গেলাম। পথের কোনও চিহ্ন পাইলাম না। সারাপথ যদি এইরূপই হয় তবে ইহা যে অতিশয় দুর্গম হইবে, তৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

ত্রয়োদশ দিন ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার—

গৌরীকুণ্ড।

এখান হইতে ক্রমশঃ পাহাড় আরোহণ করিয়া শাকম্ভরীর অল্প নিম্নে ভিন্ন পথে চলিয়া আসিয়া সোমপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। সোমপ্রয়াগ ত্রিযুগী হইতে ২ মাইল এবং সেই পূর্ব্ব দিনকার কাঠের পুল হইতে ১॥ মাইল হইবে। সোমগঙ্গা ও মন্দাকিনী দুই ভিন্ন দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। ইহা যদিও পঞ্চপ্রয়াগের অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি পুণ্যসলিল-সঙ্গম বলিয়া অনুপেক্ষণীয়। আমরা তাই এই স্থানে স্নান ও তর্পণ করিলাম। জল ভয়ানক শীতল, হাত পা যেন জড়ী ভূত হইয়া যায়। এখান হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ চড়াই। আমরা ১॥ মাইল আন্দাজ উঠিয়া মুণ্ডকাটা গণেশ দর্শন করিলাম। এখান হইতে আরও ১॥ মাইল উৰ্দ্ধে গৌরীকুণ্ড। এই স্থানে পার্ব্বতী স্নান করিতেছিলেন, গণেশ দ্বাররক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে মহাদেব তথায় আসিলে গণেশ বাধা দিলেন, তাই শিব কর্ত্তৃক ক্রোধভরে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ হয়। তার পর পার্ব্বতীর অনেক অনুনয়ে ঐরাবতের মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করা হইয়াছিল।

আমরা সাড়ে দশটার সময় গৌরীকুণ্ডে পৌছিয়া প্রথমতঃ তথাকার একটি শীতলকুণ্ডে স্নান করিলাম, তৎপর একটি তপ্তকুণ্ডে মার্জ্জন মাত্র করিলাম। জল এত গরম যে হাত দিলে যেন পুড়িয়া যায়। কিন্তু সাহস করিয়া কুণ্ডে নামিয়া পড়িলেই হয়, তখন আর তেমন তপ্ত লাগে না। স্নানান্তে হর-পার্ব্বতীর মন্দিরে গিয়া দেবতাদর্শন করিলাম। এস্থানে অনেকগুলি দোকান আছে, থাকিবার ঘরগুলিও বেশ।

এখান হইতে রামবাড়ী চটি ৪ মাইল এবং তথা হইতে কেদারনাথ ৮ মাইল মাত্র ; তাই তদ্দিনেই কেদারনাথ যাইতে মনঃস্থ করিয়া আমরা ২॥ টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। গৌরীকুণ্ড হইতেই চড়াই আরম্ভ হইল। পথ ক্রমশঃ বড় খারাপ পাইতে আরম্ভ করিলাম। স্থানে স্থানে ১॥ হাত দুই হাত মাত্র পরিসর। আবার কোন কোন স্থানে ঠিক্ খাড়া উঠিতে হইয়াছে। আমার বোধ হয়, কেদার-বদরীর পথে রামবাড়ীর এই রাস্তার ন্যায় দুর্গম পথ আর নাই। দুই এক স্থলে রাস্তার কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বৃক্ষশাখা দ্বারা তাহা "রিফু" করা হইয়াছে। অতি সন্তর্পণে ঐ সকল জায়গায় চলিতে হইয়াছিল। এইরূপ স্থানে কাণ্ডি ও ঝাপান ওয়ালারাও আরোহীদিগকে নামাইয়া হাত ধরিয়া চালাইয়া লইয়া যায়। অদ্ধপথে এক ভৈরবের মন্দির আছে। সেখানেও চীরবস্ত্র দিতে হয় ; সেই জন্য ভৈরবের নাম "চীরপটা" ভৈরব।

৪॥ টার সময় রামবাড়ী পৌছিলাম বড় ক্লান্তি বোধ হইল। মেঘদ্বারা চারিদিক অন্ধকারাবৃত থাকায় সায়ংকালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। শীতও অনুভূত হইল, তাই কেদারের দিকে কয়েক পদ চলিয়াও সে দিন কার মত এই চটিতেই থাকিয়া গেলাম। ফলতঃ সেইদিন সাহস করিয়া চলিলেও পথশ্রমে ও শীতে বিষম কষ্ট পাইতাম। ফল কিছুই বিশেষ হইত না। কেন না, গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত যে কোনও স্থানে অবস্থান করিলেই কেদারনাথ পুরীতে বাসকরার ফললাভ হইয়া থাকে। যাত্রীরা এইরূপেই কেদারে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকে। শীত খুব বেশী ; একটি পুরু কম্বলও শীত নিবারণকল্পে অপ্রচুর বোধ হইল।
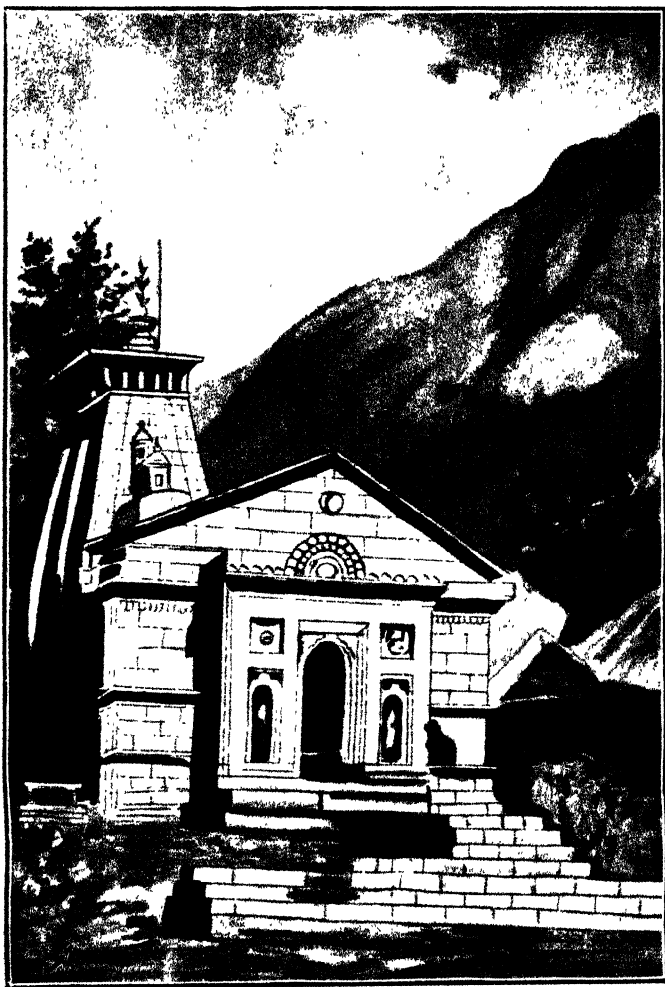
শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির

চতুর্দ্দশ দিন সোমবার ৯ইজ্যৈষ্ঠ—

শ্রীকেদারনাথ।

প্রত্যুষে উঠিলেও শীতের জন্য রোওয়ানা হইতে একটু বিলম্ব হইল। এই দিনের পথও কম দুর্গম নয়—ক্রমাগত কেবল চড়াই। তিন মাইল পর এক দেবতা স্থান পাওয়া যায়, তথা হইতে চড়াই-উৎরাই অপেক্ষাকৃত কম কিয়দ্দূর গেলেই কেদারনাথের শ্রীমন্দির নেত্রগোচর হইয়া থাকে—তখন প্রাণে যে অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। পাঠক ঐ মহাদেবের মন্দিরের চিত্র দেখুন। বলা আবশ্যক যে গাড়োয়োলের প্রায় দেবমন্দিরেরই গঠন-প্রাণালী এইরূপ।

এখান হইতে জমি বেশ সমতল; অর্দ্ধ মাইল গিয়া পুলে মন্দাকিনী পার হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা ৮॥টা প্রায়। পুরীটি ছোট হইলেও যাত্রিগণের কোলাহলে এবং নিকটস্থ মন্দাকিনী ও তৎসহচরী দুগ্ধগঙ্গার জলপ্রপাতের গভীর গর্জ্জনে সতত মুখরিত। আমরা যাইবামাত্রই পাণ্ডার ছেলে আসিয়া আমাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

তীর্থস্থান প্রাপ্তিমাত্র পার্ব্বণ করিতে হয়। কিন্তু পুরোহিত কোথায়? আমরা মন্দাকিনীতে স্নান-তর্পণ করিয়া পার্ব্বণের অধম অনুকল্প ভোজ্যদান—তাও যথানীতি নিজেরাই বাক্য বুড়িয়া সম্পাদন করিলাম। তৎপরে পুরীর উত্তর প্রান্তে শ্রীমন্দিরে মহাদেবের দর্শনার্থ চলিলাম। মন্দিরটি অতি বিশাল এবং বহু প্রাচীন। এ দেশে প্রবাদ যে, পাণ্ডবগণ দ্বাপরে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন সংস্কারার্থ রাওল সাহেব চাঁদা তুলিতেছেন। মন্দিরের মধ্যে প্রথমবার ঢুকিতে দ্বাররক্ষককে সামান্য কিছু দিতে হয়। মহাদেবের আকৃতি লিঙ্গের ন্যায় নহে; প্রায় ২॥ হাত উচ্চ

সূক্ষ্মাগ্র এক প্রকাণ্ড প্রস্তর; উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রায় ৪।৫ হাত; পূর্ব্ব-পশ্চিমে মধ্য ভাগের বেধ প্রায় ১ হাত হইবে। চারিদিক বাঁধান, উভয় দিকে একটি নালা কাটা আছে। ভিতরে ভিড় হইলে ও যাত্রীরা সকলেই কেদারের অর্চ্চনা স্বহস্তে সম্পাদন করিতে পারে। এখানে লেংটি উপহার দিতে হয়। আমরা এক খণ্ড নূতন কাপড় তদর্থ আনিয়াছিলাম। ঘৃত দিয়া মহাদেবের গাত্র লেপন করিয়া যাত্রীরা সর্ব্বশরীর দ্বারা মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। যাত্রিগণ প্রাণ ভরিয়া দর্শন স্পর্শন পূজন মার্জ্জন ও আলিঙ্গন করিয়া মন্দির মধ্যেই প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তবে এই সকল কাজ সত্বর সারিতে হয় এবং এক সঙ্গে অনেককে করিতে হয়।

কেদারে বিল্বপত্র চড়াইতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া উহা আনিতে হয়। কেদারে ৪০ মাইলের ভিতর কোনও বেলগাছ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! কেদরের যাত্রিগণ অনন্তের মত তামার বা লোহার বলয় গুপ্তকাশী প্রভৃতি স্থান হইতে কিনিয়া আনিয়া উহা কেদারের গাত্রে স্পর্শ করাইয়া ধারণ করিয়া থাকে।

কেদারের মন্দিরের সম্মুখের (দক্ষিণের) খণ্ড—অর্থাৎ জগমোহনে অনেক দেবতা আছেন। আবার মন্দিরের আশে পাশেও অনেক দেবস্থান আছে। অমৃতকুণ্ড উদককুণ্ড হংসকুণ্ড ও রেতঃকুণ্ড আছে। ঐ গুলিতে অন্ততঃ মার্জ্জন করিতে হয়। উদককুণ্ডে বহুবার নানা রকমে আচমন করিতে হয়। এইরূপে দর্শনাদি সমাপন করিয়া তীর্থে অবশ্য কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ভোজন করান হইল। হালুইকরের দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য সন্দেশ পুরী মায় তরকারী কিনিতে হইল। জনপ্রতি ।।০, ।।৵০ করিয়া ব্যয় লাগিল। আমরা তৎপর রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিলাম। সন্ধ্যার সময় কেদারের আরতি দেখিলাম। বেশী আড়ম্বর নাই।

বড় শীত। ঘরে আগুন না জ্বালিয়া থাকা যায় না। অথচ কাষ্ঠ

বড় দুর্ম্মূল্য। প্রথানু-সারে পাণ্ডাকেই যাত্রীর কাষ্ঠ যোগাইতে হয়। নচেৎ মহা অসুবিধা হইত! পাণ্ডাপুত্র আমাকে গায়ে দিবার জন্য এক-খানি কম্বলও দিয়াছিলেন। এইখানে ঘরগুলি পাকা; কবাটের বন্দোবস্তও আছে।

গুপ্তকাশীতে ক্রীতগ্রন্থ হইতে কেদারমাহাত্ম্য পাঠ করিলাম। ইহা নাকি স্কন্দপুরাণের অন্তগত কেদারখণ্ড নামক ২৫০০০ শ্লোকাত্মক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত, ইহাতে চীরবাসা ভৈরব, গৌরীকুণ্ড, মুণ্ডকাটা গণেশ অবস্থান প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।

আমরা রাত্রিতে ঘরে আগুন জ্বলিয়া শুইলাম, তথাপি বিষম শীত। এখানে কেহ এক রাত্রির বেশী বাস করে না, গৌরীকুণ্ড ও রামবাড়ীতে সহ কোনরূপে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকে।

কেদারনাথ পুরীর পশ্চিমে মন্দ্যাকিনী; উত্তরে ও পূর্ব্বে উচ্চ বরফময় পর্ব্বতশৃঙ্গ; দক্ষিণে খানিকটা ময়দান। উত্তরের পর্ব্বতের দিকে স্বর্গারোহণ মহাপথ ও ভৃগুপথ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সেখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, বরফ ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। পূর্ব্ব পর্ব্বতের দিকে ভৈরবঝম্প, উহা হইতে ঝাঁপ দিয়া নাকি পূর্ব্বে অনেকে দেহত্যাগ করিত। এখন অবশ্যই ইহা নিষিদ্ধ। মন্দাকিনীর উৎপত্তি-স্থল উত্তর-স্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গের উত্তরে ভীমতাল নামক স্থানে।

কেদারের আশে পাশে নীল, রক্ত, পীত নানা বর্ণের পুষ্প ভূইচাঁপার ন্যায় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। এই ঋতুতে বৃষ্টির জলে এই গুলির উদ্ভব হয়। কেদারের উপরে পর্ব্বতের মধ্যে একজাতীয় কমলফুল শ্রাবণমাসে ফুটিয়া থাকে। ইহা কেদারকে উপহার দেওয়া হয়। ভক্তিমান ধনী যাত্রীরা পাণ্ডার হাতে ঐ ফুল সংগ্রহ করিয়া মহাদেবের উপর চড়াইবার জন্য বহু টাকা দিয়া আইসেন।

পাণ্ডাপুত্র সুফল দিবার সময়ে আমাদিগকে গতবর্ষের আহৃত এক একটি কমল ফুল দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাপড়ি শুষ্ক ও বর্ণহীন হইলেও পদ্মেরই ন্যায় বোধ হইল। গর্ভকেশরের চতুঃপার্শ্বে আরও দশটি ছোট ছোট গর্ভকেশর, নাল অকর্ক্কশ কিন্তু শুষ্কাবস্থায় কঠিন। যাহা হউক, "ন পর্ব্বতাগ্রে নলিনী প্ররোহতি" এই কবি-বাক্য এখানে ব্যর্থ হইয়াছে।

এখানে সুফল লইতে বেশী পীড়াপীড়ি হইল না। অল্পবয়স্ক বালক বিধায়ই বোধ হয় তেমনটা হয় নাই।

পঞ্চদশ দিন মঙ্গলবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ,—

প্রত্যাবর্ত্তনে অসুস্থতা।

এই দিনও আমরা মহাদেবের দর্শনার্থ মন্দিরে গিয়াছিলাম। শীতের প্রকোপে ডাক্তার বাবু আর স্নান করেন নাই। আমাকেও সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। যে স্থানে মন্দাকিনীতে অপর দুইধারা দুই দিক্ হইতে পড়িয়া ত্রিবেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, আমি ঐ খানে পাকাঘাট হইতে অল্প ব্যবধানে গিয়া স্নান-তর্পণ করিলাম। ইহাতে অনেকক্ষণ শরীরটাতে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। আবার জুতার ঘর্ষণে দুই পায়েই ফোস্কা পড়িয়া ঘা হইয়াছিল। শরীরটা সুতরাং সে দিন বড় ভাল ছিল না।

যাহা হউক, ১২ টার সময় আহারাদি করিয়া আমরা কেদারপুরী হইতে ফিরিয়া চলিলাম। পথ প্রায়শঃ উৎরাই হওয়াতে বেশ দ্রুতগতিতেই চলিতে লাগিলাম। কিন্তু রামবাড়ী ছাড়িবার অল্প পরেই শরীরে মহা অবসাদ এবং পায়ে বেদনা বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় কোনওমতে গৌরী

কুণ্ডে গিয়া এক জনাকীর্ণ অন্ধকারময় কোঠার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ডাক্তার বাবু আমার জ্বর হইয়াছে দেখিয়া কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধপত্র এমন কি সাগো মিছরি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিল।

গৌরীকুণ্ডে সে দিন ভারি ভিড়। একেই যাতায়াতে যাত্রীরা এখানে অবস্থান করে বলিয়া প্রায়শঃ চটিতে লোকের ভিড় থাকে। তার উপর গাড়োয়ালের ডিপুটি কমিশনর সাহেব এবং কেদারনাথের সেবক রাওল সাহেব কেদারে যাইতেছেন; এবং রাত্রিবাসের জন্য সেইখানে দলবলে আড্ডা করিয়াছেন। ভাল ভাল ঘরগুলি উঁহাদেরই লোক ভাড়া করিয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা অধিকৃত, তাই স্থানের একান্ত অভাব।

রাওল সাহেব সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। বদরীনাথ এবং কেদারনাথের যাহারা মোহান্ত তাঁহাদিগকে 'রাওল সাহেব' বলে। দেবতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পূজাদি পরিচালন ইহাঁদের কাজ। তারকেশ্বরের মোহান্তের ন্যায় ইঁহারাও রাজার হালে থাকেন।

রাওল সাহেব দুই জনের মধ্যে কেহই সন্ন্যাসী নহেন, তথাপি উভয়েই অবিবাহিত। সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে জঙ্গম সম্প্রদায় ভুক্ত বলে—কিন্তু তাঁহারা নাকি তা নন। উভয়েই সদাচারী ব্রাহ্মণ। উভয়েরই নিয়োগ টিহরীর রাজা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনোনয়ন অন্যত্র যেরূপে হইয়া থাকে এখানেও সেইরূপেই হয়। বর্ত্তমান চেলাদিগের প্রধানই ভবিষ্যতের মোহান্ত। কেদারের রাওল সাহেবের আবাস উখীমঠ; এবং বদরীর রাওল সাহেবের স্থান জোশীমঠ। কেদার ও বদরীর মন্দির যখন শীতের ছয়মাস বন্ধ থাকে; তখন তাঁহাদের পূজার্চ্চনা উখীমঠ ও জোশীমঠে হইয়া থাকে— সেখানে তাঁহাদের পূজাগ্রহণের প্রতিনিধিবিগ্রহ আছেন। রাওল

সাহেবেরা গ্রীষ্মকালে মন্দির খুলিলে কেদারনাথও বদরীনাথের পুরীতে গিয়া থাকেন। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ায় বদরীনাথের মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া ছয় মাস খোলা থাকে। কেদারনাথের কোন ও নির্দ্দিষ্ট তারিখ বোধ হয় নাই। তবে এই বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে নাকি কেদার-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

ষোড়শ দিন বুধবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ—

কাণ্ডি পর্ব্ব।

প্রাতঃকালে ডাক্তার বাবু বলিলেন, জ্বর নাই। কিন্তু আমি দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিলাম। বাম পায়ের গোড়ালিতে যে ঘা ছিল সে স্থানটা এক ফোঁড়ার আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং আমার পক্ষে হাঁটিয়া পথ চলা অসম্ভব। পরামর্শ হইল, অন্ততঃ এই বেলা কাণ্ডি করিয়া চলা যাউক। আমি "আতুরে নিয়মোনাস্তি" ভাবিয়া এক কাণ্ডি ঠিক করিয়া তদারোহণে রোওয়ানা হইলাম। কাণ্ডি ঠিক করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই দেহ দেখিয়া কেহ বহন করিতে সাহস। হয় নাই। যাহা হউক, মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী লাগিল। রামপুর পর্য্যন্ত ৫ মাইল যাইতে বাহককে অনূন্য ২০বার পথে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল; এবং ২ঘণ্টার পথ ৫ ঘণ্টায় গিয়াছিল।

কাণ্ডি চড়া এক বিড়ম্বনা। খাসিয়াদের থাবায় যেমন উপাধানে মাথাটি রাখিয়া পাদানিতে পা দিয়া সুখে শুইয়া থাকা যায়—এখানে সেরূপ নয়। কাণ্ডির উপরের সীমা গ্রীবার নীচে থাকে, পা-ও কুঞ্চিত করিয়া পাদানিতে পা দিতে হয়। কখনও বা পা ঝুলাইয়াই রাখিতে হয়। আরোহীকে কখন কখন কাণ্ডির সঙ্গে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইতে হয়—নচেৎ চড়াই উঠিতে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। আমি যদিও বাঁধা পড়ি নাই তথাপি ঘাড় হেঁট্ করিয়া পা দুখানি এক প্রকার শূন্যে গুটাইয়া কতক্ষণ বসা যায়? ফলতঃ পায়ে হাটিয়া পথ চলা কাণ্ডি চড়া অপেক্ষা শতগুণে আরামদায়ক। ঝাপানেও একবার উঠিয়া মজা দেখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা পারি নাই। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে, চারিদিক যথেচ্ছ দেখিয়া শুনিয়া স্বাধীনভাবে চলা বসায় যে একটা স্ফূর্ত্তি আছে—ঝাপান বা কাণ্ডি আরোহীর সেটা হইবার যো নাই। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্ সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" জীর্ণ পীড়িত বা বিকলের কথা স্বতন্ত্র।

রামপুর এগারটার সময় পৌছিলাম। সে স্থানে ডাক্তার বাবু সাগো পথ্য দিলেন। অনেক পূয নির্গত হওয়ায় পায়ে আরাম বোধ হইল। শ্রীনগর হইতে রোপ্‌সোল কান্‌ভাসের জুতা কিনিয়া আনিয়াছিলাম—তাহা পায়ে দিয়া প্রায় তিনটার সময় রামপুর চটি হইতে পদব্রজে রোওয়ন হইলাম। সেখান হইতে ৬ মাইল ফাটা চটিতে গিয়া রাত্রি যাপনার্থ একটা দোতালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাত্রিতে দুধ রুটি পথ্য পাইলাম—শরীর বেশ ছিল।

সপ্তদশ দিন বৃহস্পতিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ—

কালীমঠ ও উখীমঠ।

আসিবার সময় গোমস্তাজীর মুখে প্রসঙ্গক্রমে কালীমঠের নাম শুনি। নারায়ণ চটি ও বেবেঙ্গ চটির মধ্যস্থলে একটি ফাঁড়ি পথ, পূর্ব্বদিকে কালীমঠ পর্য্যন্ত গিয়াছে—তাহাও দেখিয়া আসি। তদবধি সঙ্কল্প হইল, ফিরিবার সময় কালীমঠে মায়ের স্থান দেখিয়া যাইব। আজ সেই রাস্তায় যাইব—শীতও অনেকটা কম—তাই সত্বরানুষ্ঠানে চটি হইতে নির্গত হইলাম। ৭টার সময় বেবেঙ্গ পৌঁছিয়া প্রায় ৮টার সময় সেই ফাঁড়ি ধরিলাম। পথে এক প্রকার ফুল গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—দেখিলাম ঠিক খৈএর মত। তখন কালিদাসের সেই "অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈঃ আচারলাজৈরিবপৌরকন্যাঃ। এই শ্লোকাদ্ধ স্মৃতিপথে উদিত হইল।

আমরা শড়ক ছাড়িয়া ফাঁড়িপথে ১ মাইল উৎরাই নামিয়া মন্দাকিনীর উপর দিয়া জনৈক ব্রহ্মচারি-নির্ম্মিত কাঠের পুল পার হইয়া আধ মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিলাম—তার পর আরও প্রায় তিন পোয়া মাইল চলিয়া কালীমাঠে উপস্থিত হইলাম।

কালীমঠে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। যাত্রী থাকিবার জন্য এক ধর্ম্মশালাও আছে। কিন্তু দোকান-পাটের অভাব। নিকটে গ্রাম সেখানে গেলে চাউল আটা কিছু কিছু মিলিবার সম্ভব। আমরা এক বেলার খাদ্য সঙ্গে নিয়া চলিয়াছি—পূজারী ঠাকুরদের কাছ হইতে কিছু কাঠ নিলাম, ইহাতেই আমাদের চলিয়া গেল। কালীমঠ কালীগঙ্গানাম্নী নদীর তীরে। স্থানটি বড় সুন্দর, তপস্যা করিবার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাত্রীরা এই স্থানে কেহ আসে না।

এ স্থানে নানা দেবতা আছেন। ভৈরবের মন্দিরে বলি হইয়া থাকে—তচ্চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরের বহির্ভাগে হত পশুর শৃঙ্গ রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে রক্তবস্ত্র নির্ম্মিত একখণ্ড চন্দ্রতাপের নীচে দেবীর পীঠ—উহা প্রস্তর দ্বারা ঢাকা। কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে মাত্র ঢাকনি সরাইয়া পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই ইহা দেখিতে পায় না। অপর মন্দিরগুলির মধ্যে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, হরগৌরী প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। সৌভাগ্য ক্রমে আমার কাছে চণ্ডী ছিল, তাহা নিজেই পাঠ করিলাম।

আমরা পূজা-পাঠাদি সারিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে এস্থান হইতে উখীমঠের দিকে রওয়ানা হইলাম কালীমঠের ৩ মাইল দূরে কোটমহেশ্বর এবং কালীগঙ্গার অপর পারে পূর্ব্বের পাহাড়ের উচ্চশিখরদেশে কালীশিলা আছেন। আমাদের সময় সংক্ষেপ, দেখিয়া আসিতে পারিলাম না। এ স্থানে নাকি চণ্ডমুণ্ড বধ হইয়াছিল।

আমরা মন্দাকিনীর পুল পর্য্যন্ত পূর্ব্বপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক নূতন রাস্তা ধরিয়া নালা চটিতে আসিলাম—ঐ স্থান হইতে উখীমঠের রাস্তা গুপ্তকাশীর রাস্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

নালা হইতে অর্দ্ধেক রাস্তা উৎরাই নামিয়া মন্দাকিনীর পুল পার হইয়া অপরার্দ্ধ চড়াই উঠিতে হয়। কেদারনাথ হইতে উখীমঠ ৩২ মাইল কিন্তু কালীমঠ যাতয়াতে আমাদিগকে প্রায় ৩ মাইল পথ অধিক চলিতে হইয়াছিল।

উখীমঠ এখানকার তীর্থগুলির হেড্‌কোয়াটার। কালীমঠ, কেদার, গুপ্তকাশী, প্রভৃতি সকলের উপরেই উখীমঠের রাওল সাহেবের আধিপত্য আছে। জায়গাটিতে থানা, পোষ্টআফিস, হাসপাতাল এবং অনেকগুলি দোকান পাঠ আছে। দোকানে আবশ্যক সমস্তই কিনিতে পাওয়া যায়।

আমরা অপরাহ্নে ৫টার সময় এখানে পৌছি। সায়াহ্নে আরতির

সময় এখানে দর্শন করিতে গেলাম। প্রধান মন্দিরে—ওঁকারনাথ মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি, তাঁহার পশ্চাতে মান্ধাতা মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থানে নাকি মান্ধাতাও তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই মন্দির সম্মুখের খণ্ডে কেদারনাথ প্রভৃতি অনেকের মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের সংলগ্ন অপর এক দালানেও অনেক দেবদেবী আছেন—একটী ঘরে পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই ঘরের এক প্রকোষ্ঠে কেদারনাথের গদী আছে—এখানে কেদারের এক মূর্ত্তি আছেন, শীতের ছয়মাসকাল কেদারের পূজা ইনিই গ্রহণ করেন। অন্যদিকের এক বড় প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ দেখিলাম। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্রতর কুঠরীতে অনিরুদ্ধ, ঊষা, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চিত্রলেখা প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিলাম।

অষ্টাদশদিন শুক্রবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ—

বৃষ্টিতে ভিজা।

প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার দেবমন্দির ও দেবতাদিগকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। একখানি চিঠি কাশীর ঠিকানায় লিখিলাম—৫ম দিনে, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ উহা তথায় পৌঁছিয়াছিল। ঊখীমঠ হইতে লালসাঙ্গা (ওরফে চমৌলি) ২৫ মাইল—ঐখানে হরিদ্বার—বদরীর পথ পাওয়া যাইবে। আমরা বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গেলেই শোণিতপুর উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হইল। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

মাইল তিনেক চলিয়া গণেশ চটি এবং তথা হইতে প্রায় এক মাইল

উৎরাই নামিয়া দুর্গা চটি পাইলাম। নিকটে একটি নদী—উহা পুলে পার হইলে চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াই ৪ মাইল উঠিয়া পোথী চটিতে সর্ব্বাঙ্গ-কৃত্য-সম্পাদনার্থ বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

আমরা আহারাদি সমাপনান্তে প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময় মেঘাড়ম্বর করিয়া অল্পস্বল্প বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। আমরা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—কিন্তু বেলা প্রায় ৩ টা হইল, তখন অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম। কাণ্ডিতে আমাদের মাল পত্র না ভিজিবার জন্য অয়েলক্লথ দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টিপাতে আমরা নিজে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গেলাম—পথও চড়াই, আবার বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হইয়া হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব সাবধানে চলিতে হইয়াছিল। পথে প্রায় এক এক মাইল অন্তর চটি পাইলাম—কিন্তু আমাদের সঙ্কল্প ছিল, ৬ মাইল চলিয়া চোপটা চটিতে পৌঁছিতেই হইবে—কেন না, ঐ চটি হইতে আসল রাস্তা ছাড়িয়া তুঙ্গনাথ-পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে হইবে। আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল, প্রায় ৫॥ টার সময় চোপটায় পৌঁছিলাম। তখন বৃষ্টিও থামিয়া গিয়াছিল। চোপটায় ঐ দিন জেলার সিবিল সার্জ্জন সাহেব অবস্থান করিতেছিলেন—তদুপলক্ষেও অনেক লোকের সমাগম দেখা গেল। আমরা যে দিন রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারের পথে আসি, সেই দিন তুঙ্গনাথের জনৈক পাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তিনি তাঁহার নাম—গুণানন্দ রূপরাম—বলিয়া দেন এবং তুঙ্গনাথের পর্ব্বতের পাদদেশে পথিমধ্যে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এ কথাও বলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা গিয়া দেখি; সেই গুণানন্দ পাণ্ডাজী চোপটার চটিতে যাত্রি-সংগ্রহার্থ বিরাজমান। তাঁহার সহায়তায় আমরা একটি ভাল স্থানই পাইলাম এবং তিনিই যত্ন করিয়া অগ্নির ব্যবস্থাদি

করিয়া আমাদের পরিহিত বস্ত্রাদি শুকাইবার, তথা আমাদের শীত-নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আমরা আর কোনও দিন পথে এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করি নাই। আমার মনে হইয়াছিল যে, আবার বুঝি শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তাহা হয় নাই। বরং অগ্নি তাপে শরীরে একটু স্ফুর্ত্তিরই সঞ্চার হইল—রাত্রিতে দুধ-রুটি খাইয়া পরদিন চড়াই উঠিবার জন্য কিঞ্চিৎ বলসঞ্চয় করিয়া নিলাম—কেন না, তুঙ্গনাথের চড়াইর ভয়ে অধিকাংশ যাত্রী সেখানে না গিয়া এই স্থান হইতেই উদ্দেশে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বদরীর পথে চলিয়া যায়।

উনবিংশ দিবস, শনিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ,

তুঙ্গনাথ।

প্রাতঃকালে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ তুঙ্গনাথের চড়াইপথে চলিতে লাগিলাম। অর্দ্ধেক পথ নিতান্ত কঠিন নয়; বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইল না। কিন্তু অপরার্দ্ধ উঠিতে বহুবার বিশ্রাম করিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত ক্লান্তিতেও ঘর্ম্ম হইল না—শীতের নিমিত্তই বোধ হয় এই ঘর্ম্মাভাব। তিন মাইল চড়াইয়ের পর তুঙ্গনাথের বৃহৎ মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থান হইতে পাণ্ডাজী "ঐ বদরী" "ঐ কেদার" ইত্যাদি বলিয়া বরফ-মণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি দেখাইতে লাগিলেন। ফলতঃ তুঙ্গনাথ হইতে চতুর্দ্দিকে হিমালয়ের বিশাল দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, পর্ব্বতারোহণ-ক্লেশ সার্থক হইল।

তুঙ্গনাথের মন্দিরের অল্পদূরেই আকাশগঙ্গা। ঐখানে একটি অগভীর

কুণ্ডমধ্যে ফোঁটা ফোঁটা হইয়া—যেন পাহাড় চুয়াইয়া—জল পড়িতেছে, তাহাতেই যাত্রীরা স্নান তর্পণ করিয়া থাকে। আমার বড় শীত করিতেছিল, তাই ভয়ে জল গরম করাইয়া স্নান করিলাম। কুণ্ডে মার্জ্জন ও তর্পণ মাত্র করিলাম।

তৎপরে তুঙ্গনাথের দর্শন ও স্পর্শন করিলাম। যেমন পঞ্চপ্রয়াগ তেমনি পঞ্চকেদার এবং পঞ্চবদরীও আছেন। তুঙ্গনাথ পঞ্চ-কেদারের একতম। স্বয়ং কেদারনাথ অবশ্য প্রথম নম্বর। দ্বিতীয় মদমহেশ্বর বা মধ্যমেশ্বর, কালীমঠ হইয়া যাইতে হয়। তৃতীয় এই তুঙ্গনাথ; চতুর্থ রুদ্রনাথ, লালসাঙ্গায় পৌঁছিবার ৮।৯ মাইল পূর্ব্বে এক ফাঁড়ি পথে ১০।১২ মাইল যাইতে হয়। ৫ম কল্পেশ্বর, লালসাঙ্গা ও বদরীর প্রায় অর্দ্ধপথে স্থিত কুমার চটি হইতে ফাঁড়িপথে মাইল ৩।৪ যাইতে হয়।

পঞ্চ-বদরী সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে স্বয়ং বদরীনাথ ১ম; ২য় পাণ্ডুকেশ্বরস্থিত যোগবদরী; তৃতীয় জোশীমঠে নৃসিংহ বদরী, চতুর্থ বৃদ্ধবদরী (নাম সম্বন্ধে মতভেদ) প্রাগুক্ত কুমার চটির নিকটে। ৫ম কেহ বলে আদি-বদরী, কেহ বলে ভবিষ্যবদরী। ভবিষ্যবদরী জোশীমঠ হইতে নীতিপাসের শড়কে ৮ মাইল যাইতে হয়। আদিবদরীর স্থান মৈল চৌড়ির পথে পাওয়া যাইবে।

পঞ্চকেদারমধ্যে কেদারনাথ এবং তুঙ্গনাথই মাত্র দেখিতে পারিয়াছি। কিন্তু পঞ্চবদরীমধ্যে বৃদ্ধ-বদরী এবং ভবিষ্যবদরী ভিন্ন আর সমস্তই দর্শন করিতে পারিয়াছিলাম।

তুঙ্গনাথের নিকেতনে অন্য কেদারগণেরও প্রতিনিধি আছেন। এবং মন্দিরের মধ্যে ও চত্বরে গণেশ, ভৈরব, পার্ব্বতী প্রভৃতি নানা দেবতা আছেন। মন্দির মধ্যে শঙ্করাচার্য্য এবং ব্যাসদেবেরও মূর্ত্তি দেখা যায়। আমরা দর্শনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া পাণ্ডার কাছ হইতে সুফল গ্রহণ

পূর্ব্বক তুঙ্গনাথের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এ অবতরণ ব্যাপার আরোহণ হইতেও কঠিন, খাড়া উৎরাই খুব সন্তর্পণে নামিতে হয়—তিন মাইল আন্দাজ নামিয়া ভীমগোড়া চটিতে পৌঁছিতে দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

তুঙ্গনাথের পাণ্ডাগণের ঐকান্তিক যত্নেই যাত্রিগণের কেহ কেহ সেই স্থানে যায়। উহারা একখানি ভিজিট-বহি খুলিয়া ইংরাজীঅভিজ্ঞ যাত্রী দ্বারা চড়াই-উৎরাই যে তেমন কষ্টকর নহে, ইহার সার্টিফিকেট লিখাইয়া লইয়াছেন—আমাদের কাছেও তাহা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা এইরূপ লিখিতে রাজি হই নাই। যাহা হউক, এইরূপ পাণ্ডা সর্ব্বত্র থাকিলে আমরা পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদরীর আরও দুই এক স্থান হয়ত দেখিতে পারিতাম—কালীমঠ প্রভৃতিতেও যাত্রিগণ অবশ্য যাইত। ফলতঃ যদিও কোনও কোনও বিষয়ে পাণ্ডাদের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি পাণ্ডাগণের যত্নে তীর্থের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চোপটা চটি অর্থাৎ যে চটি হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে ভীমগোড়া চটি হইয়া লালসাঙ্গার শড়কে আসিতে প্রায় দুই মাইলের চড়াই। পূর্ব্বের দিনের প্রারব্ধ চড়াই এ স্থানে শেষ হইল।

আমরা চটিতে কষ্টে-সৃষ্টে এক দোকানের প্রান্তভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইহার অধিকাংশ স্থানই এক "শেঠজী" সপরিজন দখল করিয়াছিলেন। মডেল শেঠজী প্রৌঢ়বয়স্ক মাড়োয়ারী স্বয়ং ঝাপানে চড়িয়া চলেন, সঙ্গে বহুলোক—স্ত্রীলোকই অধিক—উহারা প্রায় সকলেই পদব্রজে চলিয়াছে। তিনি কোনও চটিতে উপস্থিত হইলে কে তাঁহাকে পাইবে—এই জন্য দোকানদারগণের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। কেন না, কেবল যে তিনি স্বদলবলের নিমিত্ত দোকানদারের আটা, ঘি, দাইল প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিবেন, এমন নহে—চটিতে যত

সাধু প্রভৃতি নিঃসম্বল ব্যক্তি থাকিবে, সকলকেই শেঠজী ভোজন দিবেন। তদর্থেও দোকানের বহু মাল কাটিয়া যায়। পল্লীতে ভদ্রবেশধারী যাত্রীমাত্রকেই এদেশে "শেঠজী" বলিয়া সম্ভাষণ করে—আমরাও "শেঠজী" উপাধি লাভ করিয়াছিলাম। শেঠজীদের এইরূপ অনুকম্পা ব্যতীতও সাধু সন্ন্যাসী বা নিঃস্ব যাত্রীদের উপকারার্থ স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালায় সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। মহাত্মা "কালী কমলীওয়ালার" প্রতিষ্ঠিত ঈদৃশ ধর্ম্মশালা প্রায় সমস্ত প্রধান স্থানেই রহিয়াছে।

নিঃস্ব যাত্রীরা অপরাপর যাত্রীদের কাছ হইতেও অর্থ বা খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিয়া থাকে। এ দেশে অপর ভিক্ষুকও অনেক পাওয়া যায়। পথের মধ্যে অনেকে ভিক্ষার নিমিত্ত বসিয়া থাকে। কোনও গ্রামের নিকট দিয়া গেলে ছেলে মেয়েরা পয়সা চাহিবে—অধিক বয়স্ক স্ত্রীপুরুষেরা অন্ততঃ সূই তাগা (অর্থাৎ সূচী সূতা) দিয়া যাইতে বলিবে। এই জন্য পাই, আধপয়সা, পকেটে রাখিতে হয়, অনেকে সূই-তাগাও দানার্থ সঙ্গে লইয়া আইসে।

অপরাহ্নে পূর্ব্বের দিনের ন্যায় মেঘাড়ম্বর হইল বটে, কিন্তু বর্ষণ তেমন হইল না। আমরা ৩টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং প্রায় ২ মাইল উৎরাই পথ চলিয়া জঙ্গল চটিতে উপস্থিত হইলাম। তখন অল্প অল্প করিয়া বর্ষণ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। আমরা আরও ৩ মাইল উৎরাই পথ অতিক্রম করিয়া মণ্ডলচটিতে গিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। মণ্ডলচটি অনেকটা সমভূমি দেখিলাম। ইহারই সন্নিধানে চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথ যাইবার ঝাঁড়ি পথ। ঐ পথের কিয়দ্দূর গেলেই অনসূয়ার মন্দির পাওয়া যায়।

বিংশদিন ১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার

গোপেশ্বর ও পিপুলকুঠি।

ভোরে উঠিয়া আমরা মণ্ডলচটি ছাড়িয়া অবন্ধুর পথে চলিতে লাগিলাম। এই স্থান হইতে গোপেশ্বর প্রায় ছয় মাইল; কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি চটি পাইলাম। গোপেশ্বর চটিতে আমরা অল্পক্ষণমাত্র ছিলাম; নিকটে বৈতরণী নামক একটি প্রস্রবণ আছে, ঐ স্থানে স্নান-তর্পণ করিলাম। তৎসন্নিকটে ছোট ছোট ৩।৪টি দেব মন্দির আছে। তত্রত্য দেবতা দর্শন পূর্ব্বক গোপেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরটি বেশ বড় এবং পুরাতন বলিয়াই বোধ হইল। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এবং ভিতরে পরশুরাম, গণেশ প্রভৃতি অনেক দেবতা আছেন। স্বতন্ত্র একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মীদেবী আছেন এবং তৎসমীপে বোধ হয় মোহান্তের বৈঠকখানা। শিবলিঙ্গ সর্ব্বত্রই দর্শন ও স্পর্শন করিতে পাইয়াছি, গোপেশ্বর কিন্তু স্পর্শ করিতে পারা গেল না।

এইরূপে দেব-দর্শনাদি সমাপন করিয়া আমরা ২ মাইল পথ চলিয়া লালসাঙ্গায় উপস্থিত হইলাম। লালসাঙ্গার সরকারী নাম চমোলী। আমরা বহুদিন পরে হরিদ্বার হইতে বদরীর যে বরাবর শড়ক গিয়াছে সেই প্রশস্ততর পথ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে পাহাড়ের পাথর মার্ব্বেলের ন্যায় বোধ হইল। অলকানন্দার পুল পার হইয়া লালসাঙ্গার বাজার প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমাদিগকে পুল পার হইতে হইল না আমরা আরও দুই মাইল চলিয়া মঠচটিতে গিয়া মধ্যাহ্নকৃত্যের ব্যবস্থা

করিলাম। লালসাঙ্গা অতিক্রম করিয়া আমরা বদরীনারায়ণের ফেরৎ যাত্রী দলে দলে পাইতে লাগিলাম; ইহাতে আমাদের বদরী দর্শন স্পৃহা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। কতক্ষণে এই সকল ভাগ্যবান্ ব্যাক্তিদের ন্যায় আমরাও নারায়ণ দর্শন পূর্ব্বক এই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? চমৌলী হইতে বদরী ৪৭ মাইল।

আমরা মঠ-চটি হইতে প্রায় ৩॥ টার সময় রওনা হইলাম। পথে ১।২ মাইল অন্তর এক একটি ছোট চটী পাইলাম! প্রায় ৫॥ মাইল গিয়া অলকানন্দার লৌহ সেতু পার হইয়া ১॥ মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিয়া পিপুল কুঠিতে পৌছিলাম। দূর হইতে পিপুল কুঠির পাকা মোকামগুলি পর্ব্বতের উপর সুন্দর দেখা যাইতেছিল। পিপুলকুঠি অনেকটা উখীমঠের ন্যায়—তবে ইহাতে প্রয়োজনীয় জিনিষ অনেক অধিক পাওয়া যায়। পরিষ্কার মুগ দাইল কেবল এখানেই পাইয়াছি। বদরীনাথের সাক্ষাতে চড়াইবার জন্য মেওয়া খরিদ করা হইল। গরুড়-গঙ্গায় উৎসর্গ করার জন্য পিতলের থালাও এখানেই কিনা হইল। এখানে একটি পোষ্ট অফিস আছে।

এখানে যাত্রীর বড় ভিড়। আমরা বহুকষ্টে একটি দোকানের উপর-তালা জন প্রতি ৵১৫ হিসাবে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত ভাড়া করিলাম। এখানে জলের কিছু অসুবিধা বোধ হইল। পিপুলকুঠি ও লালসাঙ্গার অর্দ্ধপথে সেই বিরহীগঙ্গার ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। সতী-বিরহী শোক-সন্তপ্ত মহাদেব নাকি ইহার তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম "বিরহী" গঙ্গা হইয়াছে।

২১শ দিন—সোমবার,—১৬ই জ্যৈষ্ঠ—

গরুড়-গঙ্গা ও যোশীমঠ।

আমরা ভোরে পিপুলকুঠী ছাড়িয়া ৩ মাইল গিয়া গরুড়-গঙ্গা পাইলাম। এখানে স্নানতর্পণান্তে পাণ্ডার গোমস্তাকে মিষ্টান্ন-পূর্ণ পিতলের থালা উপহার দিলাম। এই উপহার বদরীর পাণ্ডার প্রাপ্য; কিন্তু গোমস্তা-ঠাকুরগণ—গুপ্তকাশীর গুপ্তদানের ন্যায় ইহাও—আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, পাণ্ডাকে ইহা জানিতে দেন না। গরুড়-গঙ্গায় স্নানান্তে হাতের দিকে না চাহিয়া নদী হইতে একমুষ্টি শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিতে হয়—এইগুলির নাম গরুড়শিলা। গরুড়-গঙ্গা হইতে ৩ মাইল চলিয়া পাতাল-গঙ্গা পাইলাম। এখানে আমরা সামান্য মার্জ্জন স্নান মাত্র করিলাম। তৎপর আরও দুই মাইল গিয়া গোলাপ-চটিতে মধ্যাহ্ন কৃত্য সম্পাদন করিলাম। গোলাপ চটির নিকটেই একটি মন্দির আছে। সেখানে নারায়ণ দর্শন করিয়া আসিলাম। আহারান্তে আমরা যোশীমঠ পর্য্যন্ত যাইবার সংকল্প করিয়া চটি হইতে নির্গত হইলাম। বেলা তখন প্রায় ৪টা। আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া কুমারচটি পাইলাম। এইখানে একটি পোষ্টাফিশ আছে এবং দোকানপাটও অনেক দেখিলাম। এখান হইতে পাহাড়ের নীচের দিকে একটি ফাঁড়িপথ গিয়াছে এবং ঝোলায় অলকানন্দা পার হইয়া পথটি অন্য পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বরের পথ। কুমার-চটি হইতে প্রায় ২॥ মাইল গিয়া পেনী চটি পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, তাহারই নিকটে একটি ফাঁড়ি পথ আছে উহা ধরিয়া গেলে

অনীমঠ পাওয়া যায়, তাহাতে পঞ্চবদরীর অন্যতম বৃদ্ধবদরী অবস্থিত।

পেনী চটি হইতে প্রায় ৩ মাইল আন্দাজ গিয়া একটি ক্ষুদ্র চটি পাওয়া যায়—তাহা হইতে একটি রাস্তা নীচের দিকে বিষ্ণুপ্রয়াগে গিয়াছে, অপরটি রাজপথ যোশীমঠের দিকে গিয়াছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে, আমরা সেখানে অবস্থান না করিয়া জোশীমঠের দিকে চলিয়া গেলাম। কেন না, আমাদের সঙ্কল্প ঐ মঠে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরেই আমরা মঠে পৌঁছিলাম।

সেই রাস্তাটি নীতিপাসের দিকে গিয়াছে—সাধু-সন্ন্যাসীরা এই পথে তিব্বতে গিয়া মানস-সরোবর, কৈলাশ পর্ব্বত ইত্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন। ভাবিষ্য-বদরীও এই নীতির পথে গিয়া দর্শন করিতে হয়। কলির প্রাবল্যে নরনারায়ণ নামক অলকানন্দার দুই পার্শ্বের পর্ব্বতদ্বয় সংযুক্ত হইয়া যখন বদরীনাথের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন এই ভবিষ্য-বদরীই নাকি তৎস্থলাভিষিক্ত হইবেন।

যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত। তিনি ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারি ধামে তদীয় কীর্ত্তি মন্দিরের স্তম্ভ স্বরূপ চারিটি মঠ স্থাপিত করিয়া তাঁহার সৃষ্ট দশনামী সন্ন্যাসীদের বিভাগ করিয়া দিয়া যান। উত্তরে বদরিকার জ্যোতির্মঠ, পশ্চিমে দ্বারকার সারদামঠ, দক্ষিণে সেতুবন্ধে শৃঙ্গগিরিমঠ, এবং পূর্ব্বে জগন্নাথপুরীতে গোবর্দ্ধনমঠ সংস্থাপিত হয়। কিন্তু হায়, জ্যোতির্মঠ এবং বদরিকাশ্রমের কর্ত্তৃত্ব এখন আর শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের হস্তে নাই। বর্ত্তমান অধিকারী রাওল সাহেব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

যোশীমঠে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ্ আফিস এবং ভাল দোকানপাট আছে। আমরা রাত্রি যাপনার্থ একটি দোকানের উপরতলায় বাসা লইলাম।

মঠে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। দেবমন্দিরগুলির অবস্থা বড় ভাল নহে। যে মন্দিরে "নৃসিংহ-বদরী" রামসীতা, উদ্ধব, কুবের প্রভৃতি সহ অবস্থিত হইয়া বৎসরে ছয় মাস বদরীনাথের পূজাও গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই মন্দির একটি অতি সামান্য গৃহ। বাসুদেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে—উহাও ভগ্নপ্রায়। বাসুদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে চারি ধারেই অনেক দেবতা আছেন। শিবেরও একটি ছোট মন্দির দেখিলাম।

এ দিকে রাওল সাহেবের যে আবাসবাটীর নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে—তাহার নমুনা দেখিয়া বোধ হইল যে, উহা একটি সুসজ্জিত উত্তম প্রাসাদ হইবে।

এখানে একটি বাধান প্রস্রবণ আছে—গোমুখ দিয়া জলধারা একটি কুণ্ডে পড়িতেছে। যাত্রীরা ইহাতে স্নানাদি করিয়া থাকে। আমরা এখানে মার্জ্জন করিয়া নৃসিংহাদির আরতি দেখিলাম। বিগ্রহগুলি পুষ্পাভরণে ঢাকা—আবার পাশের একটি দ্বার দিয়া একটু ব্যবধান হইতে দেখিতে হয়, অতএব দর্শন বড় ভাল হয় না। যাহা হউক অন্যান্য দেবমন্দিরগুলিও দর্শন করিয়া আমরা সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিলাম।

দ্বাবিংশ দিবস, মঙ্গলবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর ও বদরীনাথ।

যোশীমঠ হইতে বদরীনাথপুরী ১৯ মাইল। এই পথটা অদ্য অতিক্রম করিতেই হইবে, এই সংকল্প করিয়া আমরা ভোরে উঠিয়া মঠ পরিত্যাগ করিলাম। এখান হইতে সোয়া মাইল আন্দাজ খাড়া উৎরাই নামিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগ পৌছান যায়। বিষ্ণুপ্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম। দেবপ্রয়াগ,

রুদ্রপ্রয়াগ, এবং সোমপ্রয়াগেও সঙ্গমস্থলে অত্যন্ত ভয়ানক স্রোতাবেগ। যাত্রীদিগকে তত্তৎস্থানে স্নানার্থ অতি সন্তর্পণে নামিতে হয়। কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগ ভীষণ হইতেও ভীষণতর। বাপ্, জলের কি বেগ! একদিক হইতে বিষ্ণুগঙ্গা, অন্য দিক হইতে অলকানন্দা—উভয়েই পর্ব্বতদ্বয়-মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে—দুই স্রোতস্বিনীর সংঘর্ষণে কি এক ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য; গর্জ্জনে কাণ বধির হইয়া যায়—দর্শনে মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়।

ভীরু যাত্রীরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, প্রায়শঃ এই কাণ্ড দেখিয়া জলের কাছে আসিতে সাহসী হয় না। যাহারা প্রয়াগের স্নানফল পাইতে চায়, তাহারা প্রায়ই ঘটি দিয়া জল তুলিয়া স্নান করে।

আমাদের কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি হইল না। ডুব দিয়া স্নান করিতেই হইবে। একটু সাহস করিয়া নিকটে গিয়া উপায় উদ্ভাবন করা গেল। দুই স্রোতের সম্মিলনস্থানে স্নান করা মানবের অসাধ্য, তবে প্রস্তরময় সঙ্গমস্থলে এমন স্বল্প-পরিসর কুণ্ড আছে, যাহাতে একটি লোক কোমর জলে দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে স্নান করিতে পারে। তথাপি একজন ঘাট-পুরোহিতের হাত ধরিয়া অতি সাবধানে নামিয়া অর্দ্ধ মিনিট মধ্যে কাজ সারিয়া নিলাম। তৎপর তর্পণক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক ঘাটের উপরিস্থিত দেবালয়ে নারায়ণ সন্দর্শন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখানেও একটি ক্ষুদ্র চটি আছে।

এখান হইতে যে পথে চলিতে লাগিলাম, তাহা কেদারের পথের ন্যায় স্বল্পপরিসর এবং শড়কের উপরিভাগে মসৃণতা খুব কম। ফল কথা, যোশীমঠ পর্য্যন্ত নীতিপাসের পথ—তাহাতে সরকারের মনোযোগ বেশী—তৎপর যাত্রীর পথ। যাহা হউক, সরকার বাহাদুর কৃপা করিয়া

যে পথটি করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যোশীমঠ হইতে ছাগল-ভেড়া দ্বারা বদরী পর্য্যন্ত মাল চালান হইয়া থাকে।

কিয়দ্দূর গিয়া আমাদের গোমস্তাঠাকুর অলকানন্দার দুই দিকে দুই খাড়া পাহাড় দেখাইয়া বলিলেন, এই দুই পর্ব্বত কলির প্রকোপের সময় জোড়া লাগিয়া যাইবে, তখন বদরীর পথ বন্ধ হইবে।

মাইলখানেক আরও গিয়া একটা লোহার পুল পার হইলাম—তথা হইতে ৩ মাইল ঘাট চটি এবং তৎপর আরও ২॥ মাইল চলিয়া পাণ্ডুকেশ্বর পৌছিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বর চটি বেশ বড়—অনেকগুলি দোকান আছে; স্থানটি অলকানন্দার তীরে, কতকটা সমতলের ন্যায়। পাণ্ডুকেশ্বরে দুইটি মন্দির পাশাপাশি আছে—একটিতে যোগবদরীর মূর্ত্তি, অপরটিতে ঠিক্ সেই মূর্ত্তি, কেবল উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্তদ্বয়ে ধৃত শঙ্খচক্র, চক্র-শঙ্খ পর্য্যায়ে ধৃত আছে। মন্দিরের পূজক যখন যোগবদরী দেখান, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই মূর্ত্তি বদরীনাথের মূর্ত্তির অবিকল সদৃশ। আমি লক্ষ্য করিলাম যে দেবপ্রয়াগে দৃষ্ট বদরীর ছবিতে শঙ্খচক্রের পরিবর্ত্তে শঙ্খ পদ্ম ছিল। এখানে কোনও কিছু না বলিয়া যখন নন্দপ্রয়াগে পণ্ডিত মহেশানন্দ শর্ম্মার সঙ্গে চিত্রাদির সম্বন্ধে আলাপ হয়, তখন আমি শঙ্খ-পদ্মের কথা পাড়ি। মহেশানন্দ তৎপ্রকাশিত চিত্রের এই ভুল স্বীকার করিয়া বলেন যে, তাঁহার ডিজাইনে শঙ্খ-চক্র ছিল—ইউরোপীয় চিত্রকর চক্রটাকে ভ্রমে পদ্ম করিয়া ফেলিয়াছে—ভবিষ্যতে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে! এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, বদরীনাথের মন্দিরে যখন শ্রীমূর্ত্তি দেখি, তখন হাতে যে কিছু আছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই; প্রকোষ্ঠে যথেষ্ট আলোকাভাব অথচ নিকটে গিয়া দেখার রীতি নাই।

যোগবদরীর মন্দিরে একখানি তাম্রশাসন দেখিলাম। ইহার ৪ খানি ফলক. মুখপাতের ফলকখানির উপরিভাগে একটি বৃষভমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় উহা মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে নীত হইয়া প্রাঙ্গণমধ্যে চন্দনলিপ্ত হইয়া যাত্রীদিগকে প্রদর্শিত হইতেছিল এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা আদায়ের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, এই মন্দির মহারাজ পাণ্ডুর নির্ম্মিত এবং এই তাম্রশাসনও তাঁহারই লিখিত। পাণ্ডু এইখানেই মৃগরূপী ঋষির দ্বারা অভিশপ্ত হন। তাঁহারই নামে স্থানের ও দেবতার নাম পাণ্ডুকেশ্বর হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনে কি লেখা আছে, পড়িবার অবসর পাই নাই,—সে ক্ষমতাও নাই। তবে যে ২।১ মিনিটকাল ফলকগুলি দেখিতে পাইয়াছি—ইহারই মধ্যে লক্ষ্য করিলাম যে, অক্ষরগুলি দেবনাগরের ছাঁদেই বটে; তবে আসামের তাম্রশাসনগুলির মত অনেকটা আধুনিক। বৃষমার্কা ফলকখানিই সব চেয়ে বড়, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চ × ১৮ ইঞ্চ হইবে—ইহাতে প্রায় ৪০টি পংক্তি আছে। প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৭০টি অক্ষর। অন্য তিনখানি ইহার অপেক্ষা পরিমাণে কিছু ছোট—লেখাও তেমন ঘন নয়। তথাপি ইহাতে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে—তাহা বড় সামান্য হইবে না। কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এইখানি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি ইহার অনুসন্ধান করিবেন বলিয়াছিলেন। তৎপর প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে জানিলাম যে, এইগুলি এইট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের কুমায়ূন নামক নিবন্ধে পাণ্ডুকেশ্বর ফলক নামে অভিহিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে।

পাণ্ডুকেশ্বরে মধ্যাহ্নকৃত্য সারিয়া ২টার সময় রওনা হইলাম। আধ মাইল গিয়া পথিপার্শ্বে শেষধারা নামক একটি প্রস্রবণ এবং শেষনাগের

একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম। মন্দির মধ্যে একটি যন্ত্রাকারে অঙ্কিত চিত্র দেখিলাম—উহাই নাকি শেষনাগের পীঠ। এখান হইতে লামবাগড়া নামক চটি প্রায় ২॥ মাইল—এবং তথা হইতে হনুমান চটি ৪ মাইল। হনুমান চটির এই পথটি বড় সুবিধাজনক নহে—চড়াই উৎরাই অধিক না হইলেও বড় কদর্য্য। পথে একটী স্থানে অলকানন্দার জলপ্রপাতের যে মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছি—জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। ঈষৎ ঢালু হইয়া উচ্চ হইতে পতিত প্রস্তরাহত ফেনিল ও ইতস্ততঃ কুসুম-স্তবকাকারে বিক্ষিপ্ত সলিলরাশি কি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া উদ্ধোদ্গত জলকণাগুলিতে রামধনুর সৃষ্টি করিয়া ঐ শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের আরামদায়ক গুরুগম্ভীরধ্বনি উত্থিত হইতেছে; যেন প্রকৃতির রঙ্গালয়ের নেপথ্যে যুগপৎ শত শত মৃদঙ্গ আহত হইয়া সলিলের তাণ্ডব-নর্ত্তনে অবিরাম তাল যোগাইতেছে। আমরা পথ ও পথশ্রম ভুলিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমুগ্ধচিত্তে নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

হনুমান চটিতে পৌঁছিবার অল্প পূর্ব্বে একটি স্থানে আমাদিগকে যবাদি দ্বারা হোম করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল—ঐ স্থানে নাকি মরুৎ রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

আমরা প্রায় ৫টার সময় হনুমান চটিতে পৌঁছি। তথায় হনুমানের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনাদি করিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে উদযুক্ত হইলে তত্রত্য দোকানদারদের কেহ কেহ আমাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল যে, পথ এত চড়াই যে, আমরা রাত্রির কমে ধামে যাইতে পারিব না। তখন পথে শীতে কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা আজ গিয়া বদরী-নারায়ণ দর্শন করিব, এই দৃঢ় সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া নিষেধ না মানিয়াই

চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতি সুন্দর—বিশেষ কোন চড়াই পাওয়া গেল না। তৎপর ক্রমশঃ চড়াই আরম্ভ হইল। তুঙ্গনাথের চড়াই অপেক্ষা এই চড়াই অধিক নয়; বদরীধাম পর্য্যন্ত পৌছিতে আমরা পথে বসিয়া কুত্রাপি বিশ্রাম করি নাই।

পথিমধ্যে আমাদিগকে অল্পমাত্র জায়গা—৫।৭ হাত বরফ মাড়াইতে হইয়াছিল এবং একটী নদী—বোধ হয় কাঞ্চনগঙ্গা পার হইতে জুতা খুলিতে হইয়াছিল। এইরূপ আর পূর্ব্বে কোন দিন হয় নাই।

তুই মাইল বাকী থাকিতে আমরা দ্রৌপদীর স্থান পাইলাম—সেখানে "চীর" অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র দিয়া যাইতে হয়, আমরা পরিধেয় বস্ত্রের একটুকু ছিঁড়িয়া দিয়া গেলাম, আরও খানিকটা চড়াই উঠিলে পর বদরী-নারায়ণের শ্রীমন্দিরে ধ্বজা দেখিতে পাইলাম। এই স্থানের অল্প উপরে পথের ডানদিকে কুবের-শিলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অনেকটা সমতল জমি প্রাপ্ত হইলাম। আমরা প্রায় ৭টার সময় অলকানন্দা পার হইয়া বদরীনাথের ধামে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই সর্ব্ব প্রথম পোষ্ট-অফিস পাইলাম—সেখানে আমাদের চিঠি পত্র খোঁজ করিলাম। হরিদ্বার হইতে বদরীর ঠিকানায় সঙ্গী ডাক্তার-বাবুর নামে একখানি চিঠি লিখিয়া আসি, ঐখানি বদরীনাথে ৫ম দিনে পৌঁছিয়াছিল। বদরীনাথ হইতে কাশীতে একখানি চিঠি দিয়াছিলাম—উহা ৮ম দিনে তথায় পৌছে। বদরীনাথের পোষ্ট-আফিসে টেলিগ্রাফও আছে।

পোষ্ট-আফিসে ডাক্তার জগদীশ বসু ও তদীয় সহ-ধর্ম্মিণীর নামে অনেক চিঠি দেখিলাম। কিন্তু তাঁহারা তখনও বদরী পৌঁছেন নাই। ফিরিবার পথেও লালসাঙ্গাপর্য্যন্ত ও তাঁহাদিগের কোনও সন্ধান পাই নাই।

ক্ষুদ্র শহরটি বড় জনাকীর্ণ বোধ হইল। রাস্তার তুই ধারে ঘন-সন্নিবিষ্ট

দোকান এবং উপরে নীচে সারি সারি গৃহ। আমরা এক দ্বিতল গৃহের উপরের কুঠরীতে স্থান পাইলাম।

তখনও নারায়ণের সান্ধ্য আরতির অল্প বিলম্ব আছে জানিয়া আমরা তপ্তকুণ্ডে সন্ধ্যাদি করিতে গেলাম। এই শীতপ্রধান স্থানে তপ্তকুণ্ডের জল বড়ই আরামদায়ক। এই কুণ্ড বদরীর মন্দির ও অলকানন্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুই দিক্ হইতে দুইটি তপ্ত সলিল ধারা আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে। আবার অপর দিক্ দিয়া জল নিঃসৃতও হইতেছে। কুণ্ডের গভীরতা প্রায় ২॥ হাত।

কুণ্ড হইতে অল্পদূর গিয়া আমার অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া তোরণ দ্বার পাইলাম।

ইহার মধ্য দিয়া আমরা নারায়ণের মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে প্রবেশার্থ দুইটি দ্বার—একটি পূর্ব্বদিকে, অপরটি দক্ষিণ দিকে। উভয় দ্বারে ভয়ানক জনতা দেখিলাম এবং সেই জনতার অধিকাংশ ভাগ বাঙ্গালী।

তখন ভোগ নিবেদন হইতেছিল। মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের সন্নিকটেই লক্ষ্মীর মন্দির। তৎসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড গৃহে ভোগ পাক হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের ন্যায় এখানেও লক্ষ্মীর পাক করা অন্নব্যঞ্জনের ভোগ হইয়া থাকে, তবে তথাকার ন্যায় এখানে ৫২ ভোগ নাই; ভোগের অন্নব্যঞ্জনও তেমন পরিষ্কার নহে।

জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় এই মহাপ্রসাদেও স্পর্শ-দোষ নাই, কিন্তু পাণ্ডুকেশ্বর পর্য্যন্ত নাকি এই ধামের সীমা তাহার বাহিরে প্রসাদ নিতে নাই। এই প্রদেশের খাদ্য রুটী; কিন্তু নারায়ণের ভোগে অন্নের ব্যবহার; অন্নেরই জয় দেখিয়া অন্নগত প্রাণ অস্মাদৃশ বাঙ্গালীর মনে শ্লাঘা হওয়া স্বাভাবিক।

ভোগ নিবেদিত হইয়া সরান হইলে আমরা জনতা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যতটা নিকটে যাইতে পারা যায় গেলাম। নারায়ণের মূর্ত্তি তখন পুষ্পমাল্যে ভূষিত—প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে যতদূর পারা যায় দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। এতদিন ব্যাপী পথক্লেশ সার্থক হইল মনে করিলাম।

দর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া গেলে পাণ্ডাজী আমাদের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন; গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। অন্ন, ডাল, তরকারী পাঁপরভাজা, কিঞ্চিৎ চাটনি এবং লাড্ডু এই দিনকার প্রাপ্ত মহাপ্রসাদ।

রাত্রিতে দ্বার জানালাদি বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। শীত কেদার অপেক্ষা অনেক কম বোধ হইল। কিন্তু মধ্য রাত্রিতে শ্বাস টানিতে যেন কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বাবু তাঁহার হৃৎপরীক্ষাযন্ত্র লাগাইয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই। বদরীর উচ্চতা নিমিত্ত তত্রত্য বায়ু কিছু লঘু তজ্জন্যই শ্বাস প্রশ্বাস মধ্যে মধ্যে এরূপ হয়। কিন্তু বোধ হয় ইহা সেই দিনকার চড়াই উঠার ফলও হইতে পারে।

ত্রয়োবিংশ দিবস, বুধবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, বদরীতে অবস্থান।

পরদিন প্রাতে প্রথমতঃ তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করা গেল। তৎপর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত কেদারের ন্যায় পার্ব্বণানুকল্প ভোজাদান হইল। ৮॥ টার সময় বদরীনাথের স্নানকালীন দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে গেলাম। লোকে লোকারণ্য! যাহা হউক, দেখিলাম তখন রাওল সাহেব স্বয়ং পাজামা আচকান টোপ প্রভৃতি পরিয়া নারায়ণের উপর জল ঢালিতেছেন—রাওল সাহেব ভিন্ন কেহ নারায়ণকে স্পর্শ করিতে পারে না। নারায়ণের মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের; একহাত পরিমিত উচ্চ—

দূরে থাকাতে সমস্ত অবয়ব সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তবে দেহ সংস্থান যে প্রচলিত চিত্রের অনুরূপ, তাহা বেশ বুঝা যায়। নারায়ণের পার্শ্বে অন্যান্য মূর্ত্তি অস্পষ্ট দৃশ্য। তবে চিত্রে উদ্ধব নারায়ণাদিকে যে ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে, সেরূপ কিছু দেখিতে পাইলাম না। ফলতঃ চিত্রটি অতি রঞ্জিত।

দুইটি প্রবেশ-দ্বার ব্যতীত মন্দিরের মধ্যে আলো আসিবার ব্যবস্থা নাই। প্রবেশ দ্বার দিয়া মন্দিরের সম্মুখের বড় হলটিতে অর্থাৎ জগমোহনে যাওয়া যায়; তৎপর পশ্চিমাভিমুখে নারায়ণের প্রকোষ্ঠের পোর্টিকোর ভিতর ঢুকিয়া বড় জোর উহার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। পূজাদি শেষ হইলে ঐ পোর্টিকোর প্রবেশ পথ বন্ধ হইয়া যায়। জগমোহনের প্রবেশদ্বার অন্ততঃ দক্ষিণেরটি, সর্ব্বদা খোলা থাকে; তবে দর্শনের সময় পাহারা বসে, যাহাতে সমস্ত লোক যুগপৎ উহাতে না ঢুকিতে পারে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অথবা পরে আবার ভিতরের দ্বার খুলে; তখন ভোগ আরতি হইয়া নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত ঐ দ্বার বন্ধ করা হয়।

বদরীধামে তুলসী পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবু সঙ্গে করিয়া তুলসী লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য উপহারের সঙ্গে নারায়ণকে অর্পণ করা হইল।

যাহা হউক, আমরা নারায়ণের স্নান দেখিয়া এবং সেখানে উপহার চড়াইয়া আসিয়া পিণ্ডদানার্থ ব্রহ্মকপাল-তীর্থে গেলাম। ইহা বদরীর মন্দির হইতে অল্প দূরে ঈশান কোণে অলকানন্দার তীরে। ঐ স্থানের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র এবং নাকি আমাদের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত। পূর্ব্বে মন্ত্র জানা থাকিলে উঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র বুঝিতে ক্লেশ হয় না। ইঁহাদিগকে যথোচিত দক্ষিণাদি দিয়া ঐ স্থানে অলকানন্দার ব্রহ্মকুণ্ডে তর্পণ করা গেল। তার পর সেই স্থানের এক যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি

করিয়া আরও দু এক জায়গায় দক্ষিণাদি দিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

তখন সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইল। জগন্নাথ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদির ভোজন মহাপ্রসাদ দ্বারা হয়, এ ক্ষেত্রে তাহা হইলে রাত্রি হইয়া পড়ে বলিয়াই হউক বা ভোজনকারিগণ অন্ন অপেক্ষা পুরী হালুয়াদির পক্ষপাতী বলিয়াই হউক, লক্ষীর পাকশালায় প্রস্তুত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে হালুইকর ঠাকুরের দোকানের জিনিষই ভোজনার্থ আমদানী করিতে হইল। আমাদের সঙ্কল্পিত সংখ্যা অপেক্ষা ২।৪টা অধিক খাওয়াইতে হইল কেন না, অনাহূত ভাবে কয়েকজন আসিয়া ভোজনস্থানে বসিয়া গেলেন। ব্যয় হইল জন প্রতি প্রায় আট আনা।

পাণ্ডা চন্দ্র প্রসাদকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকাল ৮টার পূর্ব্বে আমাদেরই বাসার অঙ্গনে প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছু যজমানদিগকে সুফল প্রদান করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরে স্নানাহার করিতে পারিয়াছিলেন। শুনিলাম, কোনও কোনও দিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাণ্ডা বিশেষের আয় হইয়া থাকে এখন ব্যাপার বুঝুন। তবে যাত্রীদের নিকট হইতে বেশী পরিমাণে টাকা অদায়ের জন্য বক্তৃতা এবং পীড়াপীড়িতেই তাঁহাদের সময়ের বেশীভাগ ব্যয়িত হইয়া থাকে। গয়ার ন্যায় এখানেও সুফলের টাকা সমগ্র দিতে না পারিয়া অনেকে খত দিয়া যায়।

অপরাহ্নে মন্দিরে গিয়া গীতা পাঠ করা গেল এবং বাসায় বসিয়া বদরীনাথ মাহাত্ম্যও পড়া গেল। বদরী-মাহাত্ম্যে অনেক কথা জানা যায়, যাহা পাণ্ডা বা গোমস্তা হইতে জানিতে পারা যায় না। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর পঞ্চশিলার মধ্যে কুবের শিলার নামও বলিয়াছিলেন—অথচ ঐ শিলা পুরীর বাহিরে অবস্থিত এবং পঞ্চ শিলা (নারদ শিলা, বরাহ শিলা

নরসিংহ শিলা, গরুড় শিলা ও মার্কণ্ডেয় শিলা) মধ্যে প্রকৃতপক্ষে গণনীয় নহে।

তপ্তকুণ্ড ছাড়া ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা,প্রহ্লাদধারা, নারদকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতিতে স্নান বা মার্জ্জনা করিতে হয়।

গরুড়গঙ্গা হইতে আহৃত শিলাখণ্ডগুলি তপ্তকুণ্ড নারদকুণ্ডাদিতে প্রক্ষালন করিয়া গরুড়শিলাতে স্পর্শ করাইতে হয় এবং তৎপর বদরী-নাথের মন্দিরে ছুঁয়াইয়া আনিতে হয়। এই শিলাখণ্ড ঘরে থাকিলে নাকি সর্পবৃশ্চিক প্রভৃতির দ্বারা গৃহস্থের অনিষ্ট হইতে পারে না।

আমরা সায়ংকালে আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে গিয়া দেখিলাম—বদরীনাথের আরতি পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে—ভিতরের কবাটও বন্ধ হইয়াছে। বাসায় আসিয়া পাণ্ডা প্রেরিত মহাপ্রসাদ পাইলাম—আজ লাড্ডু ও পাপর নাই, প্রসাদের পরিমাণও পূর্ব্বদিন অপেক্ষা কম।

চতুর্বিংশ দিবস—বৃহস্পতিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

বসুধারা।

ভোরে উঠিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক নারায়ণের স্নান দর্শনান্তে বসুধারা দেখিবার জন্য প্রায় ৯টার সময় রোওয়ানা হইলাম। বসুধারা বদরীপুরী হইতে উত্তর দিকে ৫ মাইল। সেই স্থানে খাদ্যদ্রব্য মিলে না—অতএব সঙ্গে কিছু খাবার নিয়া চলিলাম। পুরী হইতে প্রায় ১॥ মাইল গিয়া পুল পার হইয়া একটি গ্রাম পাওয়া যায়; ইহার নাম

'মণিভদ্রপুর'; ডাক নাম "মানা"। ইহার নিকটেই গণেশগুহা। কথিত আছে যে, ব্যাসদেব ও গণেশ এখানে বসিয়া পুরাণাদি লিখিয়াছিলেন। ব্যাস-গুহার কথা কেহ কিছু বলিতে পারে না; অনেকে গণেশগুহাকেই ব্যাস-গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

এই স্থান হইতে সরস্বতী-গঙ্গার তীর দিয়া চলিয়া, আর একটি ছোট পুল পার হইয়া, পাহাড় ছাড়াইয়াই বসুধারার জলপ্রপাত দেখিতে পাইলাম। উচ্চ পর্ব্বত-পৃষ্ঠ হইতে ধারাকারে জল পড়িতেছে, কিন্তু ঐ ধারা বায়ুতাড়িত হইয়া বৃষ্টির ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে নীচে পড়িতেছে।

ধারা দেখা গেলেও ঐ পর্ব্বতের নিকট পৌছিতে আমাদের অনেক সময় লাগিল। পথ তেমন আর স্পষ্ট চিনা যায় না, যাহা হউক ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। বাতাস বহিতেছিল; উত্তরাদকে কেবল বরফ —বরফের ময়দান দেখিলাম। পথেও কিছু কিছু বরফ পাইলাম। তার পর একটু খাড়া চড়াই উঠিয়া যে স্থানে ধারা পড়িতেছিল, তাহার সন্নিকটে একটি কুটীরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই কুটীরের দুই দিকে দুই জন সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন—কাহারও সঙ্গে শব্দ করেন না। আমাদের পূর্ব্বে কতকগুলি পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুরুষ ঐ কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল, আমরাও গিয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধুনীতে আগুন তাপাইতে লাগিলাম। সন্ন্যাসীরা ঐখানেই থাকেন; যাত্রী কেহ কেহ গেলে তাঁহাদিগকে পয়সা, খাদ্যদ্রব্য ইন্ধনাদি দিয়া আইসে। কুটীরের বাহিরে একজন ব্রাহ্মণ কতকগুলি দেবমূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছেন—যাত্রীরা বসুধারায় স্নান করিয়া ঐ স্থানেও কিছু দিয়া থাকে।

গোমস্তাজী সঙ্গে ছিলেন—বলিলেন বসুধারার জল পাপীর উপর বর্ষে না। শুনিয়া কিছু চিন্তা হইল। তারপর দেখিলাম, সকল যাত্রীই

ধারার নীচে গিয়া ভিজিয়া আসিল। তখন মনে হইল যখন নারায়ণদর্শন হইয়াছে, তখন আর পাপীর পাপ থাকে কোথায়? তাই সাহস করিয়া ধারার নীচে গিয়া বৃষ্টির জলে স্নাত হইয়া আসিলাম।

বরফ-সঙ্কুল স্থান স্বভাবতই শীতল আবার বাতাস বহিতেছিল,—জল ও ভয়ানক শীতল—তাই একেবারে জড়সড় হইয়া গেলাম।

ধারা হইতে ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া কোনও প্রকারে তর্পণ-ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক আবার কিঞ্চিৎ আগুন তাপাইয়া সন্ন্যাসিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর নামিয়া আসিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কাছে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। পুনর্ব্বার পথ চলিবার পূর্ব্বে একবার উত্তরদিকে তাকাইয়া আমাদের যাত্রার শেষ সীমা দেখিয়া লইলাম। ইহার উত্তরে যাইতে হইলে বরফ ভাঙ্গিয়া চলিতে হয়। শুনা যায় যে এদিকে অলকানদার উৎপত্তি স্থান দর্শনার্থ সাধু সন্ন্যাসীরা যান—এবং 'সত্যপদ' নামক একটি কুণ্ডও নাকি ঐ দিকে আছে—ঐখানে স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

যে পর্ব্বত-পৃষ্ঠ হইতে বসুধারা পড়িতেছে, উহাতে নাকি কুবেরের ভাণ্ডার আছে; এবং তদ্বিপরীত (পশ্চিম) দিকৃস্থিত পাহাড়টার নাম নাকি গন্ধমাদন।

যাত্রীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই বসুধারায় আইসে। বাস্তবিক বসুধারা যাতায়াত অসুবিধাকরই বটে।

ফিরিবার সময় প্রায় দুই মাইল আসিয়া ছোট পুলটি পাইবার পূর্ব্বে ডানদিকের পথ হইতে অল্প দূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাইয়া আমি একাকী ঐ নির্জ্জন স্থানে গেলাম—দেখিলাম, এক দেবমূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্বে একটি খড়্গ। পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেরা এখানে পাঁঠা ভেড়া চড়াইয়া থাকে।

যথন পূর্ব্বকথিত মানা গ্রামের নিকটে আসিলাম, তথন নদীর অপর পারে পাহাড়ের পৃষ্ঠে অন্য একটী দেবালয় দেখা গেল। গোমস্তা বলিলেন, ঐটি বদরি-নারায়ণের মায়ের—মূর্ত্তিমাতার—মন্দির।

আমরা পুলে নদী পার হইয়া বদরি অভিমুখে না গিয়া বিপরীতদিকের পথ ধরিয়া পাহাড়ের থানিকটা উঠিয়াই মন্দির পাইলাম। মন্দিরের নিকটে ঘর দেথিলাম—কিন্তু জনপ্রাণী কাহাকেও সে স্থানে দেথিতে পাইলাম না।

তথা হইতে ফিরিয়া আমরা বদরিপুরীতে প্রায় ৪॥ টার সময় পৌছিলাম। সন্ধ্যার সময় গরুড়াদিশিলা এবং কুণ্ডগুলিও দেথিলাম। কূর্ম্মধারার কাছে বদরিনাথের মূর্ত্তি কিনিতে পাওয়া যায়—তামা-রূপা প্রভৃতি ধাতুর পাতের মধ্যে ছাঁচে গঠিত মূর্ত্তি। একটী আনিতে ইচ্ছা ছিল—অনেকেই কিনে; কিন্তু গোমস্তা বলিলেন, ইহা নিলে সর্ব্বদা ইহার নিয়মমত পূজা করিতে হইবে—তাই নিরস্ত হইলাম। মূর্ত্তি অনেকটা ছাপান ছবির মত।

সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শন-ব্যপদেশে মূর্ত্তির শেষ দর্শনের জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে গেলাম। এই দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নারায়ণ সকলকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। আমরা বদরিবিশালজীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় আসিয়া পাণ্ডা চন্দ্রপ্রসাদ-প্রেরিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলাম—সেই দিন প্রসাদ কেবল ডাল ও ভাত—পরিমাণেও খুবই কম।

আমরা দুই জনে রাত্রিতে একটি ছোট শয়ন-কুঠরী ও তৎসম্মুখস্থ বৈঠকথানার ন্যায় একটী প্রকোষ্ঠ দথল করিয়াছিলাম। বাঙ্গালী বাবু, কাজ অনেক চায়—কিন্তু হয় ত পয়সা দিবার সময় কম দিবে—এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া পাণ্ডাজী ক্রমশঃ আমাদের প্রতি শিথিল-প্রযত্ন

আসিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করা গেল। তৎপর সেখান হইতে চলিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে আসিয়া জোশী মঠের পথে না গিয়া, যে পথ আসিবার দিন বামদিকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, ঐ পথে গিয়া সেই ক্ষুদ্র চটির নিকটে প্রশস্ত পথে পড়িলাম। চটিতে লোক অনেক, স্থান না পাইয়া পুনরপি পথ চলিতে লাগিলাম—দুই মাইল আসিয়া সিমুলি চটিতে কোনও প্রকারে একটু জায়গা করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। বদরি নারায়ণ হইতে এই চটি ২২ মাইল আন্দাজ।

ষড়্‌বিংশ দিবস শনিবার ২১ শে জ্যৈষ্ঠ,—

লালসাঙ্গা

এইদিন একাদশীর উপবাস, তাই পূর্ব্ব রাত্রিতে কিছু লুচি-তরকারী গোমস্তার দ্বারা পাক করাইয়া খাওয়া হইয়াছিল। চটিতে দুধ পাওয়া গেল না, অথচ কদর্য্য বলিয়া জলও পান করা হয় নাই। ইহাতে আমাশয়ের ভাব দেখা গেল। আমরা চলিয়াছিও দ্রুত বেগে। পূর্ব্বাহ্নে পাতাল গঙ্গায় স্নানাদি করিয়া কিছু জলযোগ ও দুগ্ধপান করা হইল। তৎপরে অবিশ্রান্ত চলিয়া ৬ টার সময় লালসাঙ্গা বা চমোলী পৌঁছিলাম। পুলপার হইয়া এইবার স্থানটি দেখিয়া লইলাম। অনেক দোকানপাট আছে—থাকিবার গৃহগুলিও প্রশস্ত। এখানে পোষ্ট্ আফিস (টেলিগ্রাম-সহ) ও ডিস্‌পেন্‌সারি আছে। এখানেই অবস্থান করিতাম কিন্তু পরদিন নন্দপ্রয়াগে স্নানাদি কৃত্য করিতে হইবে তাই আরও ২ মাইল গিয়া—কমল চটিতে অবস্থান করিলাম। এইদিন আমরা প্রায় ২৭ মাইল চলিয়াছিলাম, ইহাই আমাদের পর্ব্বত লঙ্ঘনের দীর্ঘতম পথ। রাত্রিতে ডাক্তার-বাবু ঔষধ দিলেন—আমাশয়ের উপশম হইয়াছিল—কিন্তু অর্শের ন্যায় একটা বেদনার উৎপত্তি হইল, ইহাতে অবশিষ্ট পথে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

সপ্তবিংশ দিবস রবিবার ২২শে জ্যৈষ্ঠ—

নন্দপ্রয়াগ।

লালসাঙ্গার পর হইতেই আমাদের পক্ষে নূতন পথ আরব্ধ হইয়াছে। কমলচটি হইতে নন্দপ্রয়াগ ৫॥ মাইল হইবে—অর্দ্ধ পথে একটি সুন্দর চটি আছে—নাম মাটিয়ানী চটি। নন্দপ্রয়াগে একটি বাজার ও পোষ্ট আফিস আছে। বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুত মহেশানন্দ শর্ম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—তাঁহার কাছ হইতে আরও কিছু পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া—কিছু নোট ও গিনি ভাঙ্গাইয়া নেওয়া গেল; কেন না, যত্রতত্র এই সকল ভাঙ্গান যায় না—কেবল ত্রিযুগী, কেদার ও বদরিতে পাণ্ডাদের কাছে ভাঙ্গাইতে পারা গিয়াছিল। কাণ্ডিওয়ালা নোট বা গিনি নিবে না—তাই তাহার জন্য এখানে টাকা সংগ্রহ করা হইল। পণ্ডিত মহেশানন্দ কেবল পুস্তক-বিক্রেতা নহেন; তাঁহার শিলাজতু বা শিলাজিত প্রভৃতি ঔষধেরও কারবার আছে। আমরা অন্যত্রও—যথা কুমারচটি হনুমানচটি ইত্যাদিতে—শিলাজতুর পাট্টাদার দেখিয়াছি। ইহারা পাহাড় হইতে শিলাজিতের মাটী-পাথর সংগ্রহ করিয়া আনে—এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত রীতিতে রৌদ্রের গরমে তপ্ত করিয়া বিশুদ্ধ শিলাজিত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে।

শিলাজিত ছাড়াও স্বর্ণমাক্ষিক, ডলু, নির্বিষা প্রভৃতি অনেক খনিজ ও উদ্ভিজ্জ ঔষধ পাওয়া যায়—পিপুলকুঠীর এক দোকান হইতে আমরাও ২।১ টা ঔষধ কিনিয়াছিলাম। এ ছাড়া চামর, কম্বল প্রভৃতি আরও নানা জিনিস এই অনন্ত রত্নপ্রভব হিমালয়-প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দা ও নন্দগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। স্থান অনেকটা সমতল হওয়াতে এই প্রয়াগে ভীষণ স্রোতোবেগ নাই। ইচ্ছামত নামিয়া স্নান তর্পণ করা গেল।

প্রয়াগঘাটের নিকটেই তীরদেশে মহাদেবের মন্দির আছে, সেখানে দর্শনাদি করিয়া বাজারের মধ্যে নন্দ, যশোদা প্রভৃতির এক মন্দির দেখিলাম। নন্দপ্রয়াগেই নাকি কণ্বমুনির আশ্রম ছিল। তবে এই আশ্রম শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বের আশ্রম বলিয়া বোধ হইল না। কেন না, সেই "সৈকতলীনহংসমিথুনা" মালিনী এখানে কোথায়?

নন্দপ্রয়াগ হইতেই নিদাঘ-সূর্য্যের খরতর কিরণ পুনরায় অনুভূত হইতে লাগিল। আমরা আহারাদি করিয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রৌদ্রের তেজ কিঞ্চিৎ কমিতে আরম্ভ করিলে চটি হইতে নির্গত হইলাম। আরও ৮ মাইল গিয়া জয়কুণ্ডি চটিতে রাত্রিযাপন করিলাম। পথে প্রায় দুই দুই মাইল অন্তরেই ছোট ছোট চটি পাইয়াছিলাম।

অষ্টাবিংশ দিবস সোমবার, ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ।

কর্ণপ্রয়াগ ও আদিবদরি।

জয়কুণ্ডি হইতে কর্ণপ্রয়াগ প্রায় ৪॥ মাইল হইবে। কর্ণপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত পিণ্ডরগঙ্গা (ওরফে কর্ণগঙ্গা) সঙ্গত হইয়াছে। এই স্থানেও স্রোতোবেগ কম, আমরা স্বচ্ছন্দে নামিয়া স্নান-তর্পণাদি করিলাম। মহারাজ কর্ণ এখানে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রভূত সুবর্ণাদি দান করিয়া নামটি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে ঘাটের পাণ্ডারা অন্নদান করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ঘাটের উপরে মহাদেবের মন্দির এবং ইহারও একটু উপরে উমা-দেবীর এক প্রাচীন মন্দির।

এই সকল দর্শন করিয়া আমরা পিণ্ডরগঙ্গার উপরের পুল পার হইয়া কর্ণপ্রয়াগের বাজার পাইলাম। এখানে আমাদের যাত্রার সহায় গোমস্তাজী আমাদের কাছ হইতে বিদায় লইয়া রুদ্রপ্রয়াগের পথে অর্থাৎ তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা অপর দিকের সড়কে মৈলচৌরী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। কর্ণপ্রয়াগে একটি পোষ্ট-আফিস আছে।

এখান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ প্রায় ২০মাইল—বদরি হরিদ্বারের ঐ পথটুকু মাত্র আমাদের দেখিবার বাকী থাকিল—যদিও ইহাতে দর্শনের তেমন কিছু নাই।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে মৈলচৌরী পর্য্যন্ত (২৯ মাইল) যে শড়কটি গিয়াছে, ইহা ভাল রাস্তা—মাইল-ষ্টোন নিয়মমত প্রোথিত আছে। আমরা ৪ মাইল গিয়া সিমুলি চটিতে আহারাদি করিলাম। এই চটির সন্নিকটে

ঈশানকোণে পিণ্ডরগঙ্গার পারে একটি দেবালয় আছে—এখানে চণ্ডিকা আছেন—মহাদেবাদিও আছেন। চণ্ডিকার নিকটে ছাগাদি বলি হইয়া থাকে।

এখান হইতে চলিয়া মধ্যপথে ভাটোলি চটি অতিক্রম পূর্ব্বক সায়াহ্নে আদি-বদরি (বা আদ্-বদরি) পৌছিলাম। এই সকল চটিতে বদরির ফেরৎ যাত্রীরা মাত্র আইসে, সেই জন্য বিশেষ ভিড় হয়না। আদি-বদরির মন্দির পথেরই কিনারায় এবং চটির সংলগ্ন। তথাপি অনেক যাত্রী মন্দিরে গিয়া দেবতার দর্শন করিতে চায়না—বোধ হয়, উহাদের অর্থাভাবই ইহার কারণ। নচেৎ যে আদি-বদরি পঞ্চ বদরির অন্যতম বলিয়াই সাধারণতঃ খ্যাত, তাঁহার দর্শনকল্পে এত বিমুখতা হইবার কোনও কারণ নাই। আমরা সন্ধ্যার পর গিয়া বদরির আরতি দর্শন করিলাম। আদি-বদরি কর্ণপ্রয়াগ হইতে ১১ মাইল।

ঊনত্রিংশ দিবস মঙ্গলবার—২৪শে জ্যৈষ্ঠ,

মৈলচৌড়ী

এই দিন অমাবস্যা—তাই প্রাতঃকালে চটির সমীপস্থ নারায়ণগঙ্গায় স্নানাদি করিয়া পুনশ্চ আদি-বদরির দর্শন করিলাম। এই মূর্ত্তি বদরি-নাথের মূর্ত্তির ন্যায় নহে। মূর্ত্তি বড় এবং হস্তে যথাক্রমে গদাপদ্ম-শঙ্খ-চক্র (উপরের ডান হাত হইতে উপরের বাম হাত পর্য্যন্ত) রহিয়াছে। শঙ্খ-চক্রাদির সংস্থানের বিভিন্নতায় নারায়ণের নানা সংজ্ঞা হয়—তাহা অনুসন্ধিৎসুগণ জানিতে পারেন। বদরির মন্দিরের পাশে আরও অনেক দেব মন্দির আছে। কিন্তু সকল গুলিরই আকৃতি ছোট। এক লিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন—তাঁহার নাম "আদি কেদার।" জানকী, হনুমান্, গরুড়, অন্নপূর্ণা ও মহিষমর্দ্দিনীকেও দর্শন করিয়া, আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, চটি হইতে প্রায় ৭টার সময় বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে ২।৩টি চটি অতিক্রম করিয়া, আমরা ১১টার সময় ৮ মাইল গিয়া সিমকোটি চটীতে আহারাদিকরিয়া, ৩টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। মৈলচৌড়ী রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে গাড়োয়াল জিলা শেষ হইয়া আল্মোড়া জিলা আরম্ভ হইল। কাণ্ডি, ঝাপান প্রভৃতি গাড়োয়ালের কোনও কিছু আল্মোড়ায় যাইতে পারে না—এই এক মহা অসুবিধাকর প্রথা। আমরা এখানে কাণ্ডিওয়ালাকে বিদায় দিলাম। রাত্রিতে দুই জনলোক জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য ৪॥০ টাকায় নিযুক্ত করিলাম। এখানে আরোহণার্থ এবং জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। কিন্তু দর দস্তুর করিয়া ভাড়া ঠিক করিতে হয়; তথাপি সাধারণতঃ চড়িবার ঘোড়া ১০৲ টাকায় এবং মোট বহনের ঘোড়া বা মানুষ ৫৲ টাকায় (মণ করা) এখান হইতে রামনগর পর্য্যন্ত (৬৮ মাইল) নিতে পারা যায়। এখানে ঝাপান মিলে; কিন্তু কাণ্ডি—অন্ততঃ মোট-বহনার্থ—মিলে না বলিয়াই যেন বোধ হয়।

ত্রিংশ দিবস—বুধবার—২৫শে জ্যৈষ্ঠ,

নূতন পথ ও বৃদ্ধ কেদার।

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া রওয়ানা হইলাম। প্রথম এক মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিয়া তৎপর কতকটা উৎরাই চলিয়া বেশ সমান রাস্তা পাওয়া গেল। ৮ মাইল গিয়া চৌখুটী নামক স্থানে রামনগরের নূতন রাস্তা ধরিতে হইল।

পূর্ব্বে চৌখুটি হইতে যাত্রীরা কাঠগোদাম যাইত. এখন রামনগর পর্য্যন্ত রেল আসাতে লোকে রামনগরই গিয়া থাকে। চৌখুটী হইতেও আমরা বেশ এক শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি দিয়াই চলিলাম। একজন স্থানীয় লোক আমাদিগকে বলিল যে, এ স্থলেই বিরাটরাজার রাজ্য ছিল—এই মাঠে তাঁহার গরু চরিত, নিকটেই কীচকবধের স্থান। দ্বৈতবন ও কাম্যবন ইহারই নিকটে ছিল। পর্ব্বতের উপর চারি মাইল আন্দাজ দূরবর্ত্তী স্থানে একটি পুষ্করিণী আছে, সেই স্থান হইতে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল; ইত্যাদি।

আমরা এক মাইল গিয়াই ভাতকোট চটি পাইলাম। তৎপর দুই মাইল অন্তর চিনোনি চটি ছাড়িয়া এক মাইল গিয়া ভাগোটি চটিতে মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিলাম।

এ স্থান হইতে চলিয়া এক মাইল অন্তর তেহার চটি পাইলাম; এটি বেশ ভাল স্থান। আরও এক মাইল গিয়া সানিশাল চটিতে একটি মন্দিরে মহাদেব সন্দর্শন করিয়া একটি বাঁধান জলাধারের উৎকৃষ্ট শীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিলাম। এই পথে এই প্রকার

জলাধার আরও দুই একটি দেখিয়াছি এইগুলির তলদেশের সহিত প্রস্রবণের যোগ আছে বলিয়া বোধ হইল।

তারপর মাইল খানিক গিয়া মাসি চটি পাওয়া গেল। এইটি বেশ বড় চটী। তৎপর ৪ মাইল চলিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বুড়া কেদারের স্থানে পৌছিলাম।

আমরা যে দুইটি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, ইহাদের একটি ব্রাহ্মণ, অপরটি ছত্রি। উভয়েই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য—সামান্য ১৮।১৯ সের মাত্র বোঝা নিয়াও চলিতে পারিল না। অথচ ইহাদের দুই জনের বোঝা এক জন গাড়োয়ালী কাণ্ডিওয়ালা অনায়াসে লইয়া যাইত। ইহাদের নিমিত্ত আমাদিগকে এই স্থানেই রাত্রিযাপন করিতে হইল।

সন্ধ্যার সময় রমাগঙ্গা হাঁটিয়া পার হইয়া চটির অপর-পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ কেদারের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। এ স্থানের ব্রাহ্মণদের অবস্থা বড় ভাল নয়। আল্‌মোড়ার রাজা রুদ্রসেন নাকি আন্দাজ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ কেদারের নামে কিছু ভূসম্পত্তি তাম্রশাসন দ্বারা দান করেন—উহাই এখন সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জীবিকা। নূতন পথে যাত্রীরা এখানে আসে বটে, কিন্তু কেদারের দর্শনার্থ নদীর অপ.রপার্শ্বে অতি কম যাত্রীই গিয়া থাকে।

 দ্ধ কেদার একটী গোল দীর্ঘ প্রস্তর; ভূপতিত অবস্থায় বিরাজমান। দৈ‍ে ৬।৭ হাত এবং বেড় ৩।৪ হাত হইবে। মন্দিরে পার্ব্বতীও আছেন। আমরা সান্ধ্য আরতি দেখিয়া রামগঙ্গা পুনরায় পার হইয়া একটি ভগ্ন দোতালা ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করিলাম।

একত্রিংশ দিবস—বৃহস্পতিবার—২৬শে জ্যৈষ্ঠ,

গো-শকটের পথে।

ভোরে উঠিয়া ৪ মাইল চলিয়া নালা এবং তৎপর ৩॥ মাইল চলিয়া বিকিয়াসের চটি পাইলাম; এ স্থানে একটি ক্ষুদ্র নদী পদব্রজে পার হইয়া এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতে উঠিলাম, সেই হইতে চড়াই উঠিতে উঠিতে ২ মাইল পরে শিরকোট চটি, এবং তৎপর ৩ মাইল চলিয়া বাসোট চটিতে পৌছিলাম। এইটিই আমাদের শেষ চড়াই; পথে জলাভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বাসোট চটিতে আমরা মধ্যাহ্নকৃত্য করিলাম। কিন্তু এখানকার জল পরিমাণে অতি সামান্য এবং তেমন ভালও নয়।

এখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া রামনগর যাওয়া যায়, অনেক যাত্রী তাহাই করিল। আর দেড় দিনের জন্য গোশকটে চাড়িয়া পুণ্যের মাত্রা কমাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না,—যদিও আমি অর্শের ভাব ছাড়া ডানি পায়ের কড়ি আঙ্গুলে ফোস্কাজনিত একটা ঘায়েও কষ্ট পাইতেছিলাম এবং পা টা কতক ফুলিয়াও গিয়াছিল।

আমরা এই চটি হইতে বহির্গত হইয়া দুই মাইল পর সিম চটি, তৎপর ১ মাইল অন্তর গোয়ালখানা হইয়া তথা হইতে ৩ মাইল চলিয়া গুজরঘাটিতে উপস্থিত হইলাম। এইখানে গাড়ীর উপর 'টোল' আদায় হয়।

আমরা এইস্থানে আসিয়া রাণীখেত ও রামনগরের অত্যুৎকৃষ্ট [illegible]কে পড়িলাম। রাণীখেত এই স্থান হইতে ২৩ মাইল এবং রামনগর ৩৩ মাইল।

এখান হইতে কাপড়নলি ২॥ মাইল, এবং তথা হইতে দেওলখণ্ড ২॥ মাইল। দেওলখণ্ডে আমরা রাত্রিযাপন করিলাম।

দ্বাত্রিংশ দিবস—শুক্রবার—২৭শে জ্যৈষ্ঠ,

রামনগর।

এই আমাদের হিমালয়-ভ্রমণের শেষ দিন; শড়কও ভাল, বেশ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। দুই মাইল চলিয়া গড়ি চটিতে পৌঁছিলাম। এ স্থান হইতে গাড়ীর শড়কে টোটা-আম চটিতে যাইতে হইলে ৬ মাইল লাগে। কিন্তু একটি ফাঁড়ি রাস্তা আছে, তাহাতে ১॥ মাইল মাত্র উৎরাই পথ চলিয়া সেই চটিতে আমরা পৌঁছিলাম। আবার টোটা-আম চটি হইতে কুমেরিয়া চটি গাড়ীর শড়কে যাইতে হইলে ৬ মাইল লাগে। টোটা-আম হইতে অতি অল্প দূর গিয়াই বামদিকে একটী ফাঁড়ি পথ নামিয়া গিয়াছে। এই স্থানে গড়ির ফাঁড়ির ন্যায় কোনও সাইন্‌-বোর্ড নাই, অথচ খুব তলাইয়া না দেখিলে রাস্তাটি সহসা দেখা যায় না। প্রকৃতই আমরা ঐ পথটি ছাড়িয়া প্রায় আধ মাইলের উপর চলিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, পশ্চাৎ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আমি ফাঁড়ির জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ফাঁড়িতে প্রায় ২ মাইল চলিয়া কুমেরিয়া চটি পাইলাম। ডাক্তারবাবু আর ফিরিলেন না। তিনি শড়কের পথেই চলিয়া আমার প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে কুমেরিয়া আসিলেন।

কুমেরিয়াতে কুশী নদী হাঁটিয়া পার হইতে হইয়াছিল। কাঁচা পুলটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

কুমেরিয়া হইতে একটা রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর দিয়া প্রায় ৫ মাইল চলিয়া চৌফলা চটিতে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করা গেল। চৌফলার নিকট দিয়া কুশী নদী প্রবাহিত, ঐ নদীর গর্ভে চরের মধ্যে একটি ভগ্নাগ্র মন্দিরাকার টিলার উপর দেবতাস্থান-সূচক নিশানাদি দেখিলাম।

শুনিলাম দেবতার নাম উপরদেবী ; এখানে প্রায় সর্ব্বদাই পাঁঠা প্রভৃতি বলি হইয়া থাকে। যাহারা এ স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ উপরে যায়, তাহারা বলি সহকারে পূজা দিয়া যায়। বর্ষাকালে চারিদিক্ জলাকীর্ণ হইলে তখন পূজাদি হয় না। একজন ব্রাহ্মণ এখানে ফরেষ্ট গার্ডের কাজ করেন, তিনিই পূজার কাজ চালাইয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়া স্থানটি দেখিয়া আসিলাম। লোহার শিকল ধরিয়া টিলায় চড়িতে হয়।

এ স্থান হইতে চলিয়া কিয়দ্দূর গিয়া পাকা পুলে কুশী পুনশ্চ পার হইয়া গরজিয়া চটীতে পৌঁছিলাম। কুমেরিয়া হইতে গরজিয়া ছয় মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে যখন কুশী পার হওয়া অসম্ভব, তখন কুমেরিয়ার অপর পার হইতে আর একটি পথে ১১ মাইল ঘুরিয়া গরজিয়ায় গাড়ী প্রভৃতি যায়।

গরজিয়া হইতে রামনগর ৭ মাইল। আমরা সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে রামনগর পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে লোকারণ্য দেখিয়া তথা হইতে ফিরিয়া বাজারে রাত্রির জন্য একটি দোতালা ঘরের উপরতালা ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিলাম।

উপসংহার।

রামনগর হইতে প্রাতে ৬টায় এবং তৎপর ১১টায় গাড়ী মোরাদাবাদ যায়। আমরা পরদিন শনিবার ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া কুশীর তীরস্থিত একটি দেবালয়ে নারায়ণ ও মহাদেব দর্শনান্তে তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ৬টার গাড়ীতে মোরাদাবাদ রওয়ানা হইলাম। সেইস্থানে প্রায়

১১টায় পৌঁছিয়া বারাণসীর গাড়ীতে চড়িলাম। ডাক্তার-বাবু পালামৌ জংশন ষ্টেশনে সন্ধ্যার সময় অবতরণ করিলেন—উদ্দেশ্য নূতন রেলপথে নিমথার গিয়া নৈমিষারণ্য দর্শন। আমার শরীরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, তাই আমি বরাবর রেলে চলিয়া পরদিন রবিবার প্রাতে বারাণসী আসিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।